Contents

তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১৫

Contents

তাওহীদের ডাক

২৩তম সংখ্যা

মে-জুন ২০১৫

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও স্টার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা ও মানবতাবোধ

রোহিঙ্গা মুসলিমরা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ন্যায় আরাকানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। আরাকানকে প্রাচীন সময়ে রাহমী রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়, যাকে এখন রামু বলা হচ্ছে। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি ছাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেন *(হাকেম ৪/১৩৫ পৃঃ)*। সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। বাংলার গভর্নর সুলতান নাছিরুদ্দীন শাহের সহযোগিতায় বাদশাহ সুলায়মান শাহ কর্তৃক ১৪৩০ সালে আরাকানে প্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ আমলে ভারত, বাংলা ও বার্মার রাজ্যসীমা একই হওয়ার কারণে অনেক মুসলিম ভাগ্যান্বেষণে আরাকানে পাড়ি জমান। তাদের কেউ কেউ স্বদেশ ফিরে এলেও অনেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

'রোহিঙ্গা' শব্দটি রাখাইন থেকে উদ্ভূত। যেমন রাখাইন>রোয়াং>রোহিঙ্গা। রোয়াং তিব্বতী শব্দ, যার অর্থ আরাকান। অদ্যাবধি চট্টগ্রাম যেলায় রোয়াং এবং রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা দ্বারা যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়। আরাকানের বিতাড়িত রাজা নরমিখলা ১৪৩০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে মুহাম্মাদ সুলায়মান 'শাহ' সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং লংগিয়েত থেকে রাজধানী লেম্ব্রু (Lembru) নদীর তীরবর্তী ম্রোহাং (Mrohaung) নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাই সে সময় আরাকানের রাজধানী ছিল 'ম্রোহাং'। সেটারই অপভ্রংশ হল, রোহাং বা রোসাঙ্গ। আর এর অধিবাসীদেরকে বলা হত 'রোহিঙ্গা'। ১৪৩০ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত আরাকানের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ।

আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ মুসলিম। বৃটিশ শাসিত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ বর্গ মাইল। বর্তমানে আরাকানের আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল। এর মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম, ৪ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী (animists) এবং ২ লক্ষ হিন্দু ও খ্রীস্টান। বৃটিশরা ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীনতাত্তোর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখতে মুসলিম ও মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। এভাবে তারা ১৯৩৭ সালে বার্মা আলাদা করার পর বৃটিশ প্রশাসন HOME RULE (local self Government of 1937) জারি করে এবং বার্মায় আভ্যন্তরীণ সরকার গঠনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুইনসহ নীচু অংশে ৩০,০০০ মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৪০ সালে বৌদ্ধ ধর্ম ও তার প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে থাকিন পার্টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে, যার পরিণতি হিসাবে ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম হত্যার উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই '৪২ ম্যাসাকার'-এ আরাকানের পথে পথে হাযার হাযার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নাফ নদী ছিল অসংখ্য মুসলিম নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রোহিঙ্গার লাশে পরিপূর্ণ। এ সময় লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়, প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিমের বসতবাড়ী উচ্ছেদ করা হয়। এরূপ নৃশংস ঘটনা ঘটতেই থাকে।

১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী মিন গন দুর্ধর্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে National Registration Card (NRC) তল্লাশীর অজুহাতে কল্পনাতিত নির্যাতন চালায়। ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রায় ৪০০ জন রোহিঙ্গা মহিলাকে ধরে এনে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাছাড়া ১লা মার্চ ড্রাগন অপারেশনের নামে শত শত রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি ১৬ মার্চ তাদের উন্মত্ত লালসা মেটানোর জন্য ১০০ জন মহিলা ধরে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে। এ অপারেশনে ১০ হাযারেরও বেশী রোহিঙ্গা হত্যা করা হয়। প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আসে এবং পথিমধ্যে ৪০ হাযার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ অকাতরে মৃত্যুবরণ করে। ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর হতে ১৯৯২ সালের ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত ২২ দিনে আরাকান থেকে প্রায় ২১ হাযার রোহিঙ্গা যুবক এবং ৫ হাযার যুবতীকে অপহরণ করা হয় এবং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। কারো শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। অসুস্থ রোহিঙ্গা যুবকরা যখন পালাতে থাকে, তখন নির্যাতনকারীরা তাদের পেছন দিকে মারতে থাকে এবং ক্রূর হাসি হেসে বলে, 'কোথায় তোদের আল্লাহ? তাকে এসে তোদের রক্ষা করতে বল'। সরকার ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে আরাকানের মংডু শহরে ৫টি রোহিঙ্গা পল্লী জ্বালিয়ে দেয়। জানুয়ারী মাসে ৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষুধা, অনাহারে-অর্ধাহারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক হাযার রোহিঙ্গা মারা যায়। ২০০০ সালে ৪৫০টি বাড়ী ধ্বংস করে দেয় এবং বসতবাড়ী ও কৃষি খামারের ২০০ একর জমি বাযেয়াপ্ত করে। এরপর থেকে নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। বহিরাগত বা অভিবাসী হিসাবে তাদের মিয়ানমারে থাকার অধিকার নেই বলে তাদের সবাইকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। অন্যদিকে এই আদম সন্তানরা পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিতে গেলে তাদেরকে ঠাঁই দেয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিতে গেলে তাদেরকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ফলে অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে নৌকার উপর ভাসমান অবস্থায় কালাতিপাত করছে। আহাজারি করছে আর ক্ষুধার তাড়নায় তাকিয়ে থাকছে কেউ কোন দিক থেকে একটু খাবার বা পানি নিয়ে আসছে কি-না। এভাবে না খেয়ে হাযার হাযার মানুষ মারা যাচ্ছে। গণকবর দিয়ে চিরদিনের জন্য ইতিহাস থেকে হারিয়ে ফেলা হচ্ছে, অসংখ্য বনু আদমের সলিল সমাধি হচ্ছে। এই করুণ অবস্থার কারণে নারী-শিশুর গগনবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। নিজ দেশে থেকে তারা আজ অভিবাসী হিসাবে বিতাড়িত কিন্তু কেউ তাদের পক্ষে কথা বলার নেই। এতে বিশ্ব মোড়লদের হৃদয়ে একটু কষ্ট অনুভূত হয় না। কারণ এরা মুসলিম জনগোষ্ঠী। মানবতাবোধ বলতে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরা যদি মুসলিম না হয়ে ইহুদী-খ্রীস্টান বা অন্য কোন জাতি হত, তবে তাদের ব্যবস্থা ঠিকই হত, বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হত।

এই মাযলূম জনগোষ্ঠীর আশ্রয় দেয়ার এখন কেউ নেই। তবে এদেরকে যে আল্লাহ নিদর্শন হিসাবে পৃথিবীবাসীকে দেখাচ্ছেন, তা পরিষ্কার। এরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আদম সন্তান। আল্লাহ্‌র যমীনে এদের বসবাস করার ও বেঁচে থাকার অধিকার অবশ্যই আছে। তারা গৃহহীন হয়ে মাযলূম অবস্থায় যালেমদের বিরুদ্ধে যে বদ দু'আ করছে, তা আল্লাহ কখনোই ফেরত দিবেন না। কারণ মাযলূমের দু'আ আর আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা থাকে না। যারা তাদের উপর এ ধরনের অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাচ্ছে, তারা কি আল্লাহ্‌র গযব থেকে রক্ষা পাবে? ভূমিধস, ভূমিকম্প, সুনামি, আয়লার মত গযব আল্লাহ পাঠালে অত্যাচারীদের পরিণতি কী হবে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে? ফেরাউন, নমরূদ রক্ষা পায়নি, এ সমস্ত চুনোপুঁটি কি রক্ষা পাবে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার উপর দয়া করেন না' *(আহমাদ হা/১৯১৬৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, আসমানের অধিবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন *(তিরমিযী হা/১৯২৪)*। অতএব রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের কারণে আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে চারিদিক থেকে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। আল্লাহ প্রদত্ত মহা বিপদ থেকে তখন বাঁচার কোন পথ থাকবে না। অতএব অত্যাচারীরা সাবধান!

এছাড়া যাদের কিছু করার সামর্থ্য আছে, তারা যদি এই মাযলূমদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তবে তারাও ঐ অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রত্যেক মানুষের একান্ত দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ হতে মুক্ত করুন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে অভিভাবক নির্বাচন করুন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী নির্ধারণ করুন' *(নিসা ৭৫)*।

আমরা বিশ্ব মোড়লদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, অতি সত্বর মুসলিম রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ আরাকানে স্থায়ী নাগরিক হিসাবে বসবাসের সুব্যবস্থা করা হোক। যে সমস্ত স্বার্থান্বেষী মহল তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের শাস্তির বিধান করা হোক। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছি, হে আল্লাহ! আপনি এই সমস্ত বিতাড়িত অসহায় মানুষদেরকে আপনার বিশেষ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন এবং নিজ দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুব্যবস্থা করুন-আমীন!!

আল্লাহ্‌র ভালবাসা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

(১) 'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

২- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

(২) 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে পসন্দ করেন' *(তওবা ৯/৭)*।

৩- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

(৩) 'তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদেরকে বিচার নিষ্পত্তি কর না, অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর না। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন' *(মায়েদা ৫/৪২)*।

৪- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

(৪) 'বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

৫- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

(৫) 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৪)*।

৬- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

(৬) 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুন্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*।

৭- كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ-وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ.

(৭) 'না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর' *(ক্বিয়ামত ৭৫/২০-২১)*।

৮- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

(৮) 'তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*।

৯- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

(৯) 'তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হ'ল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপসন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

১০ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ- وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ- وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.

(১০) 'মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত এবং সে অবশ্যই ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল' *('আ-দিয়াত ১০০/৬-৮)*।

হাদীছে নববী :

১১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ.

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু জাবর (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঈমানের নিদর্শন হ'ল আনছারদের ভালবাসা এবং নিফাক্বের নিদর্শন হ'ল আনছারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা *(বুখারী হা/১৭; মিশকাত হা/৬২০৬)*।

১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম হ'ল আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পসন্দের ছিয়াম। আর সবচেয়ে পসন্দের ছালাত হ'ল দাঊদ

(আঃ)-এর ছালাত। কারণ তিনি রাতে অর্ধেকাংশ ঘুমাতেন, তিনভাগর একভাগ ছালাত আদায় করতেন এবং ছয়ভাগের একভাগ ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন ছিয়াম রাখতেন এবং একদিন ছিয়াম ছেড়ে দিতেন *(মুসলিম হা/২৭৯৬)*।

١٣- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(১৩) বারা ইবনু আযেব (আঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনছারগণ মুমিনদের ভালবাসেন এবং মুনাফিক্বদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেন। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষন করবে আল্লাহ তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবেন *(বুখারী হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৬২০৭)*।

١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

(১৪) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামত কবে সংঘঠিত হবে? তিনি তাকে বললেন, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুত গ্রহণ করেছ? সে বলল, আমি এর জন্য অধিক কিছু ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ আদায় করতে পারেনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তারই সাথী হবে *(বুখারী হা/৬১৭১)*।

١٥- عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما قَالَ وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ.

(১৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকায় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। যথা (১) সহনশীলতা এবং (২) ধৈর্যশীলতা *(মুসলিম হা/১২৭; মিশকাত হা/৫০৫৪)*।

١٦- عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(১৬) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের এক নারীর চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বলল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) ছাড়া কে আর তাঁর নিকট বলার সাহস করবে? *(বুখারী হা/৩৭৩২)*।

١٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

(১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে ভালবাসেন এবং হাই ওঠাকে অপসন্দ করেন। যখন কারো হাঁচি ওঠবে তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। আর প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক্ব হ'ল যখন তা শুনবে তখন তার উত্তর দিবে। আর হাই আসে শয়তানের নিকট থেকে। তখন তোমরা সাধ্যমত ওটাকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। কেননা শয়তান সে সময়ে অট্টহাসি দেয় *(বুখারী হা/৬২২৩; মিশকাত হা/৪৭৩২)*।

١٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى.

(১৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কোথায় আজ সেই ব্যক্তিরা যারা আমার ইযযতের জন্য পরস্পর ভালবেসেছিল, আজকে আমি তাদেরকে আমার ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করব, যেদিন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না *(মুসলিম হা/৬৭১৩; মিশকাত হা/৫০০৬)*।

١٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهْوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.

(১৯) আবু হুরায়রা (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বিজোড় এবং বিজোড়কে পসন্দ করেন *(বুখারী হা/৬৪১০)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদী বন্ধু তার অপর বন্ধুর জন্য যা করে এবং যা তার সমীপে পেশ করে তা তার নিকটে সর্বাধিক আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর। তিনি এগুলোকে কষ্টদায়ক মনে করেন না।

২. শায়খ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভালবাসা, তাঁর প্রত্যাশা ও ভালবাসার মত উত্তম আল্লাহ্র সীমারেখা, নিষিদ্ধ কর্ম ও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীকেও পায়নি।

৩. সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) বলেন, বান্দার জন্য আল্লাহ্র ভালবাসাক বিশাল মহৎ কাজ এবং পর্যাপ্ত যথার্থ মর্যাদাপূর্ণ, যা মূল্য দ্বারা কেউ পেতে পারে না।

সারবস্তু

১. আল্লাহ্র মুহব্বত ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং ইসলামের সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে।

২. সাথীর অন্তরে আল্লাহ্র বরকত ও নে'মত সর্বদা আবৃত রাখে।

৩. বিপদাপদ ও দুঃখের সময় প্রকৃত বন্ধু প্রকাশ পায়।

৪. আল্লাহ্র জন্য কোন ভাইকে ভালবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার ন্যায়।

৫. আল্লাহর ভালবাসা পেতে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালবাসতে হবে।

শিরকের পরিচয় ও পরিণাম

-মুযাফফর বিন মুহসিন

ভূমিকা :

আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা বা তাওহীদকে পোক্ত করার জন্য তাওহীদের তিনটি পর্যায়কে চূড়ান্তভাবে ধারণ করতে হবে। (ক) তাওহীদে রুবূবিয়াহ (খ) তাওহীদে উলূহিয়াহ এবং (গ) 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'। এই তিনটি বিষয় পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ্‌র অধিকার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এর পুরস্কার স্বরূপ বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয়-

عَنْ مُعَاذ ﷛ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِه وَمَا حَقُّ الْعِبَاد عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَاد أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِه شَيْئًا.

মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর গাধার পিছনে ছিলাম। তাকে বলা হত 'উফাইর'। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার কী? আর আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই বেশী অবগত। তখন তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার হল, তারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার হল- যে বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না, তাকে শাস্তি না দেওয়া।[১]

পরিচয় :

'শিরক' শব্দের অর্থ অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহ্‌র ইবাদতে বা অধিকারে অন্য কোনকিছুকে সংশ্লিষ্ট করাকে 'শিরক' বলে। শিরক দু'প্রকার। (ক) শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যা মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তওবা ছাড়া মারা গেলে ঐ ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। (খ) শিরকে আছগার বা ছোট শিরক, যা ব্যভিচার ও মদ পানের চেয়েও জঘন্য পাপ।[২] এ জন্য বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অধিকার হল, সে কোনকিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।

শিরকের ধরন :

সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিরক চালু আছে। এগুলোর কোনটি বড় শিরক, আবার কোনটি ছোট শিরক। যেমন- (১) জ্ঞানগত শিরক (২) ব্যবহারগত শিরক (৩) ইবাদতে শিরক (৪) অভ্যাসগত শিরক (৫) ভালবাসায় শিরক।[৩]

জ্ঞানগত শিরক (الشِّرْكُ فِى الْعِلْمِ) :

শিরক মিশ্রিত জ্ঞান অর্জনের কারণে সমাজে এ ধরনের শিরকের বিস্তার লাভ করে। যেমন আল্লাহ ছাড়াও অন্য কেউ গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখে বলে ধারণা করা। এটা আল্লাহর অধিকারের সাথে অন্যকে শরীক করা হল। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখে না। । মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ. 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা এটাও বুঝে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ৬৫)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ... مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ.

'আয়েশা (রাঃ) বলেন,... যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে।[৪]

ব্যবহারগত শিরক (الشِّرْكُ فِى التَّصَرُّفِ) :

জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। এর সাথে যদি অন্য কাউকে বা কোন বস্তুকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি আপনি মুশরিকদের জিজ্ঞেস করেন- কে আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই উত্তরে বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন! আল-হামদুলিল্লাহ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তবে তাদের অধিকাংশই জানে না' *(লুক্বমান ২৫)*। কতিপয় নাস্তিক ছাড়া সবাই আল্লাহকে স্রষ্টা ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করে থাকে। তবে ছূফী তরীক্বার কিছু লোক উক্ত কর্ম সমূহে 'গাউছ', 'কুতুব', 'আবদাল' প্রভৃতিকে শরীক করে থাকে। এ ধরনে বিশ্বাস শিরকে আকবার বা বড় শিরক।

ইবাদতে শিরক (الشِّرْكُ فِى الْعِبَادَةِ) :

ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ বেশী শিরক করে থাকে। আর এর অধিকাংশই শিরকে আকবার বা বড় শিরক। যেমন- কবরপূজা, মাযার, মূর্তি, খানকা পূজা, সেখানে সিজদা করা, মানত করা, নযর দেয়া ইত্যাদি। দু'আ করা বা কিছু পাওয়া, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তির জন্য মৃত পীরের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া। আল্লাহ্‌র ইবাদত বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনো শিরকের ছোঁয়া লাগলে আল্লাহ্‌র মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। তাই আল্লাহ কঠোর শর্ত পেশ করে বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَـــدًا 'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

---

১. ছহীহ বুখারী হা/২৮৫৬, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুসলিম হা/১৫৩, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২; মিশকাত হা/২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

২. শারহু কিতাবুত তাওহীদ, ২/১০ পৃঃ; শারহু নাওয়াক্বিযিল ইসলাম, পৃঃ ৩; আহমাদ হা/২৩৬৮৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৩৩৪। عَنْ مَحْمُوْد بْنِ لَبِيْد أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً.

৩. শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী, রিসালাতুত তাওহীদ, পৃঃ ৬৪।

৪. ছহীহ্ বুখারী হা/৭৩৮০।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে আর তাতে আমাকে ছাড়া অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শরীককে বর্জন করি।[৫]

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 'তাদের প্রতি শুধু আদেশ করা হয়েছে, তারা একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে অংশীদার স্থির করে, তা থেকে তিনি মহাপবিত্র' *(তওবা ৩১)*। অন্যত্র বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'তাদেরকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও যাকাত প্রদান করবে। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন' *(সূরা বাইয়েনাহ ৫)*।

অভ্যাসগত শিরক (اَلشِّرْكُ فِى الْعَادَةِ) :

অভ্যাসগত শিরক সমাজে কুসংস্কার হিসাবে চালু আছে, যাকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না। অথচ তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটা কথার মাধ্যমেও হয় কিংবা প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে হয়। অথবা কর্মের মাধ্যমেও হয়। তাই সঠিকটা না জেনে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা এমন কথা বলো না, যা তোমাদের যবান সমূহ বলে থাকে- এটা হালাল ও এটা হারাম। যাতে তোমরা আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাক। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, তারা কখনোই সফল হবে না' *(নাহল ১১৬)*।

'দশ যেখানে খোদা সেখানে', রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটা যায় না, বাড়ী বা দোকানে সন্ধ্যা বাতি, আগর বাতি জ্বালানো, রাত্রিতে গাছের পাতা ছেঁড়া যায় না, কর্য দেয়া যায় না, উঠান ঝাড়ু দেয়ার পূর্বে ফকীরকে ভিক্ষা দেয়া যায় না ইত্যাদি। মৃতের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা ও তাতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা। অথচ এগুলোর ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই। মুসলিমদের চেতনাকে শিরকের মিশ্রণে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের চেতনা ছিল আপোসহীন নির্ভেজাল তাওহীদী চেতনা। একদা ওমর (রাঃ) ফযীলতপূর্ণ কালো পাথর দেখে যা বলেছিলেন, তা চিরস্মরণীয়-

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

আবেস বিন রাবী'আ (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি 'কালো পাথর'-কে চুম্বন করার সময় বলছেন, নিশ্চয় আমি জানি যে, তুমি কেবল পাথর মাত্র। তুমি ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৬]

ভালবাসায় শিরক (اَلشِّرْكُ فِى الْمُحَبَّةِ) :

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা দেখাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপরে তাকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ্র ভাষায় শুনুন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ.

'মানুষের মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে মা'বূদ মনে করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। তবে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে অত্যধিক ভালবাসে। আর যারা অত্যাচার করেছে, তারা যদি শাস্তি দেখতে পেত, তবে বুঝতে পারত- যাবতীয় ক্ষমতার উৎস আল্লাহই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। যখন নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন অনুসারীরা বলবে, আমরা যদি ফিরে যেতে পারতাম, তবে তারা যেমন আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমরাও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করাবেন। আর তারা কখনো জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না' *(বাক্বারাহ ১৬৫-৬৭)*।

অতএব আল্লাহ তা'আলার বিধানের উপর অন্য কোন ব্যক্তি, দার্শনিক, পণ্ডিত, ইমাম, ফক্বীহ ও মুজতাহিদের রচিত বিধান ও আদর্শকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। অন্যথা ক্বিয়ামতের মাঠে উক্ত আয়াতে বর্ণিত পরিণতি ঘটবে।

সুধী পাঠক! এছাড়াও ভয়-ভীতিতে শিরক (اَلشِّرْكُ فِى الْخَوْفِ), তাওয়াক্কুলে শিরক (اَلشِّرْكُ فِى التَّوَكُّلِ), আনুগত্যে শিরক (اَلشِّرْكُ فِى الطَّاعَةِ), দু'আয় শিরক (اَلشِّرْكُ فِى الدُّعَاءِ), ইত্যাদি ধরন নিয়েও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন।[৭]

পরিণাম :

আল্লাহ্র অধিকারে একটু ত্রুটি হয়ে গেলে ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রথমতঃ শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই পাপ কখনো ক্ষমা হবে না। দ্বিতীয়তঃ সারা জীবনে অর্জিত নেকী ধ্বংস হয়ে যাবে। মূলতঃ শিরক করলে আল্লাহ তা'আলাকে অপমান করা হয়। শিরকের পরিণাম সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল-

(ক) শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'তুমি আল্লাহ্র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয় শিরক মস্ত বড় অপরাধ' *(লুকমান ১৩)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ.

আব্দুর রহমান (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কাবীরা গোনাহের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বড়, সে সম্পর্কে আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব না? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বলুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এমতাবস্থায় তিনি

৫. ছহীহ মুসলিম হা/৭৬৬৬।
৬. বুখারী হা/১৫৯৭, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; মিশকাত হা/২৫৮৯।
৭. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, আল-ইরশাদ ইলা ছাহীহিল ই'তিক্বাদ ওয়ার রাদ্দি আলা আহলিশ শিরকি ওয়াল ইলহাদ, পৃঃ ৩১২।

ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। এভাবে তিনি বারবার বলতেই থাকলেন। অবশেষে আমি বললাম, হয়ত তিনি আর থামবেন না।[৮]

(খ) শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :

শিরক করে কোন ব্যক্তি মারা গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তাই কারো দ্বারা এই জঘন্য পাপ সংঘটিত হলে তাকে সাথে সাথে তওবা করতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا. ‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি চাইলে অন্য পাপ ক্ষমা করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে, সে দূরতম পথভ্রষ্ট হবে’ *(নিসা ৪৮ ও ১১৬)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِىْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِىْ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার করেছ এবং আশা দিয়েছ বলে আমি তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। হে আদম সন্তান! তোমার পাপ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও তোমার পাপ ক্ষমা করে দিব। এতে আমি কোন পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন সমপরিমাণ পাপ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও, আর তাতে যদি শিরক না থাকে, তবে আমি তোমার কাছে এতটুকু সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব’।[৯]

(গ) যাবতীয় সৎ আমল বাতিল হয়ে যায় :

আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‘তারা যদি শিরক করে, তাহলে তারা যা আমল করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৮৮)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

‘নিশ্চয় আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহি নাযিল করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন’ *(যুমার ৬৫)*।

(ঘ) শিরককারীর উপর জান্নাত হারাম :

শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শিরক না করলে জান্নাত, করলে জাহান্নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ. ‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান হবে জাহান্নামে। আর এরূপ অত্যাচারীর জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(মায়েদাহ ৭২)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বলেন, দু’টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উক্ত দু’টি বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০]

(ঙ) শিরককারীর জন্য রাসূল (ছাঃ) শাফা‘আত করবেন না :

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। কিন্তু তিনি শিরককারীর জন্য শাফা‘আত করবেন না। তিনি বলেন, فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ‘আমি ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করব, যে আল্লাহ্র সাথে কোনকিছুকে শরীক না করেই মারা গেছে’।[১১]

হুঁশিয়ারী :

উক্ত হাদীছ এবং উপরে বর্ণিত আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি যদি ‘শিরকে আকবার’ বা বড় শিরক করে এবং তওবা না করে মারা যায়, তবে সে আর কোন দিন জান্নাতে যেতে পারবে না। চিরস্থায়ীভাবে কাফের-মুশরিকদের মত জাহান্নামে থাকবে। ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’ কালেমা পড়েও কোন লাভ হবে না। তবে শিরক না করে অন্য যেকোন পাপ করে তওবার পূর্বে মারা গেলে তার জন্য তিনটি বাঁচার পথ খোলা আছে। (ক) শিরক না করার কারণে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে ক্ষমা করে দিবেন।[১২] (খ) উক্ত পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে যেতে পারবে।[১৩] (গ) উক্ত দু’টি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করার পর কালেমার বদৌলতে এক সময় জান্নাতে যাবে। কিন্তু শিরকে আকবার করে মারা গেলে এবং তওবা করার সুযোগ না হলে বিন্দুমাত্র ছাড় নেই।[১৪] কাফের-মুশরিকদের মত চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

শিরকের উক্ত ভয়াবহ অবস্থার কারণেই রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিয়েছেন, لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ‘তুমি কোনকিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়’।[১৫]

---

৮. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭৬, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৫০।

৯. তিরমিযী হা/৩৫৪০, ২/১৯৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৯; মিশকাত হা/২৩৩৬, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘তওবা ও ইস্তিগফার’ অনুচ্ছেদ।

১০. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯, ১/৬৬ পৃঃ, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, ‘ঈমান’ অধ্যায়।

১১. তিরমিযী হা/২৪৪১, সনদ ছহীহ।

১২. সূরা নিসা ৪৮ ও ১১৬; তিরমিযী হা/৩৫৪০, ২/১৯৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়।

১৩. তিরমিযী হা/২৪৪১, সনদ ছহীহ।

১৪. তিরমিযী হা/৩৫৪০, ২/১৯৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৯; মিশকাত হা/২৩৩৬, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘তওবা ও ইস্তিগফার’ অনুচ্ছেদ।

১৫. আহমাদ হা/২২১২৮, সনদ ছহীহ; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২০২৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫, ‘কাবীরা গোনাহ ও মুনাফেক্বীর নিদর্শন’ অনুচ্ছেদ।

সুধী পাঠক! তাওহীদ বা আল্লাহ্র অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সর্বদা আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, পালনকর্তা হিসাবে বান্দা যেমন আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তেমনি আইন ও বিধানদাতা হিসাবেও বিশ্বাস করবে। নিজের রুচি মোতাবেক কোন বিধান রচনা করবে না। আল্লাহ মনোনীত চূড়ান্ত জীবন বিধান ইসলামকে বাদ দিয়ে ইহুদী-খ্রীস্টানদের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতি শিরকী মতবাদকে সমর্থন করা যাবে না, গ্রহণও করা যাবে না। অন্যথা 'তাওহীদে রুবূবিয়ার' মাঝে শিরক প্রবেশ করবে, যা দুধের মধ্যে গোমূত্র বা চোনা ফেলার মত হবে। অনুরূপভাবে মাথা নত করা, সাহায্য চাওয়া, প্রার্থনা করা, দান করা, যবহ ও মানত করা যাবতীয় ইবাদতের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই নির্ধারণ করতে হবে। খানকা, মাযার, কবর, গাছ, পাথর, মৃত পীর, শহীদ মিনার, প্রতিকৃতি, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা জানানো, সংসদে নীরবতা পালন করা, পতাকাকে সালাম দেওয়া, কুর্নিশ করা, ভাষা দিবস, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিনকে শ্রদ্ধা জানানো ও পূজা করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে 'তাওহীদে উলূহিয়ার' মাঝে শিরক প্রবেশ করবে। অনুরূপ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর সাথে অন্য কোনকিছুকে তুলনা করলে 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাতের' সাথে শরীক করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণভাবে নির্ভেজাল তাওহীদের আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

সমাজে প্রচলিত কতিপয় শিরক :

(১) কবরে সিজদা করা (২) মূর্তি, ভাস্কর্য, প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়া ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা (৩) মৃত পীরের দরগায় গিয়ে তার কাছে সাহায্য চাওয়া (৪) পীরকে অসীলা করে দু'আ করা ও মুক্তি চাওয়া (৫) কবরে মানত করা, গরু, ছাগল-মোরগ নযর-নেয়ায করা ও টাকা-পয়সা দান করা (৬) খানকায় পোষা কুমীর, কচ্ছপ, মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মনে করা (৭) মাযারে বার্ষিক ওরস করা (৮) কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা (৯) কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা (১০) মাযারে দান না করলে মৃত পীরের বদ দু'আ লাগবে বলে ধারণা করা (১১) পীরের দরগায় দান করলে পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল হবে এবং মামলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা (১২) মৃত পীর কবরে জীবিত আছেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন মর্মে আক্বীদা পোষণ করা (১৩) কবরে সৌধ নির্মাণ করা, তার সৌন্দর্য বর্ধন করা ও মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা (১৫) কোন দিবস বা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে মঙ্গলময় মনে করা (১৬) গণকের কাছে যাওয়া ও তার শিরকী মন্ত্রে বিশ্বাস করা। এগুলো সবই শিরকে আকবার বা বড় শিরক (১৭) শরীরে তা'বীয, তামার আংটি, চেইন, মাযার কর্তৃক বিতরণ করা ফিতা বাঁধা।

তাবীয সম্পর্কে হুঁশিয়ারী :

মুসলিম সমাজে তাবীযের ব্যাপক প্রচলন। এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে, যার শরীরে তাবীয নেই। ছেলে সন্তানের গলায়, কোমরে ও হাতে তো আছেই। একশ্রেণীর আলেম এবং কথিত কবিরাজ তাবীয ও মাযারের সুতা বিক্রি করে রীতিমত ব্যবসা করছেন। কতিপয় ছাপাখানা কুরআন ছাপার নামে কুরআনের সাথে শিরকী নকশা ছাপিয়ে এই ভ্রষ্ট আলেমদের ব্যবসাকে আরো বেশী রমরমা করেছে। কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয লিখে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা থেকে মুক্ত করে থাকে। অথচ তাবীয বাঁধা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। তাবীয, সুতা বা অন্য কিছু শরীরে বাঁধা শিরক। তাই তাবীয পরা অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না, কোন আমল কবুল হবে না এবং এই অবস্থায় মারা গেলে শিরককারী হিসাবে আল্লাহ্র ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত হবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْه رَهْطٌ فَبَايَعَ تسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحد فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله بَايَعْتَ تسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْه تَميْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

উক্ববা বিন আমের আল-জুহানী বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে একটি কাফেলা আগমন করল। অতঃপর তিনি নয়জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে বাদ দিলেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নয়জনকে বায়'আত করালেন আর একে ছেড়ে দিলেন কেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার শরীরে তাবীয বাঁধা আছে। অতঃপর লোকটি শরীরের ভিতরে হাত দিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। তারপর রাসূল (ছাঃ) তাকে বায়'আত করালেন এবং বললেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয বাঁধল সে শিরক করল'।[১৬]

শরীরে তাবীয রাখা কত বড় অন্যায় ও জঘন্য কাজ, তা উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়। এই তাবীয রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করা থেকেও বিরত রাখতে সক্ষম। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ 'নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক করা, তাবীয বাঁধা, যাদুটোনা শিরক'।[১৭] অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عِيْسَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِه حُمْرَةٌ فَقُلْتُ أَلَا تُعَلِّقُ تَمِيْمَةً؟ فَقَالَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

ঈসা বিন হামযা (রাঃ) বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ বিন উকাইম-এর কাছে গেলাম। তখন তার শরীরের লাল রঙের তাবীয বাঁধা ছিল। আমি বললাম, তুমি তাবীয বেঁধে রেখেছ? আমরা আল্লাহ্র কাছে এটা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শরীরে কোনকিছু বাঁধবে, তাকে সে দিকেই সোপর্দ করা হবে'। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিরাপত্তা থেকে সে বেরিয়ে যাবে।[১৮]

জ্ঞাতব্য : কুরআনের আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত দু'আ দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা শরী'আত সম্মত। এছাড়া শিরক মিশ্রিত কোন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হারাম।[১৯] রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক্ব, নাস প্রভৃতি সূরা ও আয়াত দ্বারা ফুঁক দিয়েছেন, শরীর মাসাহ করেছেন এবং ক্ষতস্থান হলে তাতে থুথু দিয়েছেন।[২০]

---

১৬. আহমাদ হা/১৭৪৫৮; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২।

১৭. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫৩, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২-২৭৩, 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অনুচ্ছেদ।

১৮. তিরমিযী হা/২০৭২; সনদ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/৩৪৫৬; মিশকাত হা/৪৫৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫৭, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪।

১৯. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮৬২, 'সালাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২; মিশকাত হা/৪৫৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩১, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭।

২০. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৩৫-৫৭৩৭, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২, ৩৩, ৩৪।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

-ইহছান এলাহী যহীর

ভূমিকা :

বিতাড়িত শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ হ'ল জিহাদের সকল স্তরের চেয়ে কঠিনতম জিহাদ। এই প্রকারের জিহাদ আঞ্জাম দেয়া প্রতিটি মুমিন-মুসলিমের আবশ্যিক কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা করে শয়তানের অনুসারী হ'লে জাহান্নামে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ 'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তার দলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়' *(ফাতির ৩৫/৬)*। একারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর একান্ত রহমতের দ্বারা তিনি আমাদেরকে সর্তক করেছেন। যাতে আমরা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হই এবং শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করি, তার কথা না শুনি ও তার থেকে দূরে অবস্থান করি। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সেজদা করেছিল'। সে অগ্রাহ্য করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) মানব সৃষ্টির আদি ইতিহাসের অবতারণা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আদম (আঃ)-এর দেহে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পূর্বে তার শরীরটা চল্লিশ বছর যাবৎ পড়ে ছিল। এ সময় ইবলীস খুবই হিংসা-বিদ্বেষ করত। আর সে আদম (আঃ)-এর শুরু থেকে হিংসা-বিদ্বেষ করছে এবং আদম সন্তানের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে এই অপচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সে আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় চলাচলের ক্ষমতা রাখে। তাইতো অব্যাহতভাবে তার বিরুদ্ধে আদম সন্তানকে সংগ্রাম করতে হবে। যাতে করে কোন আদম সন্তান তার দলে শামিল না হয় এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِى جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِه حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِى الْحِجَابِ. 'শয়তান বনী আদমের জন্মলগ্নে প্রত্যেকেকেই তার আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা দেয়। তবে মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) তা থেকে মুক্ত। শয়তান তাঁকে খোঁচা দিতে গিয়ে পর্দায় খোঁচা দিয়ে আসে' *(বুখারী হা/৩২৮৬)*।

◈ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের পদ্ধতিসমূহ :

নিম্নে বিতাড়িত, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইবলীস শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রকৃতি, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হল :

(ক) সর্বদা তার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তার শত্রুতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে :

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (যুখরুফ ৪৩/৬২)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে মানবগণ! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা থেকে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

'(ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছিল এবং বলেছিল, কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয়-লাভ করতে পারবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হ'ল, তখন সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সটকে পড়ল এবং বলল, তোমদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না। আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখ না, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর' *(আনফাল ৮/৪৮)*।

(খ) তওবা করে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ দ্বীন ও নির্ভেজাল তাওহীদে প্রত্যাবর্তন করা :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন' *(মুসলিম হা/৭০৩৬)*।

(গ) কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করা :

আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'তোমরা সকরে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ে যেও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যে নে'মত আছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তৎপরে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হ'লে এবং তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে; অনন্তর আল্লাহই তোমাদেরকে ওটা থেকে উদ্ধার করেছেন, এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

(ঘ) আল্লাহ্র যমীনে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা :

আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় নিবে। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 'যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে' *(নাহল ১৬/৯৮)*।

(ঙ) শয়তানের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা :

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের সুহৃদগণের সাথে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*।

(চ) ব্যাপকভাবে ফাসাদ, যুলুম, ঘুষ, চুরি, খেয়ানতের বিস্তার ঘটা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. 'যামানা নিকটবর্তী হবে, আমলের কমতি হবে, কৃপণতা চাপিয়ে দেয়া হবে, ফিতনার ছড়াছড়ি হবে, হারজ বৃদ্ধি পাবে। তখন সমবেত ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হারজ কী? হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, হত্যা' *(বুখারী হা/৭০৬১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ. 'ক্বিয়ামতে আলামতগুলো হল, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, ইলম কমে যাবে, যিনা-ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ্য পান করা হবে, পুরুষ কমে যাবে, নারী বৃদ্ধিপাবে। এমকি পঞ্চাশজন নারীর জন্য একজন মাত্র পুরুষ তত্ত্বাবধান করবে' *(বুখারী হা/৫৫৭৭)*। আর এগুলি সবই হবে শয়তানী কুমন্ত্রণায়।

(ছ) মুসলিম মিল্লাতের ফাটল ও দলাদলি :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 'নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয় আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে রয়েছে, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 'যারা নিজেদের ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল' *(রূম ৩০/৩২)*। আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا 'নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*।

◈ শয়তানের শয়তানী কর্মকাণ্ডের ফলাফল :

শয়তান চায় আল্লাহ্র ইবাদত থেকে আদম সন্তান মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রবৃত্তি পুজারী হউক। মানুষ এক আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহ্র উপাসনা করুক। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত কর না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইয়াসীন ৩৬/৬০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 'তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত যে মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতঃপর সে যখন কুফরী করে তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*। অতএব সাবধান, হে শয়তানের পুজারী!

ক. মুসলিমদেরকে দুর্বল করা ও তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা :

বর্তমানে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্যের ভিত নষ্ট হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, শয়তানের অনুসরণ করা ও আল্লাহ প্রদত্ত অহীর বিধান থেকে বিমুখ হওয়া।

খ. শিরক-বিদ'আতের জয়জয়কর; আল্লাহ্র স্মরণে ও ইবাদতে গাফেলতী ও ধর্মীয় অজ্ঞতা :

আল্লাহ বলেন, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 'শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তারাই শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا– لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী

Contents

প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তারা বিতাড়িত শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না। আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং সে বলেছিল যে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য হ'তে নির্দিষ্ট একটি অংশ গ্রহণ করব' *(নিসা ৪/১১৭-১১৮)*। আল্লাহ ইরশাদ করেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান। অতঃপর সেই হয় তার সহচর' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ 'শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের স্থানেও চলাচল করে' *(বুখারী হা/৩২৮১)*।

গ. শয়তানের পাতানো বেড়াজাল :

যে সমস্ত কাজকর্ম করতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন সেগুলোই হ'ল শয়তানের পাতানো বেড়াজাল। নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডই হ'ল আল্লাহ্র সীমারেখা। যখন সেই সীমারেখা কেউ অতিক্রম করে, তখন সাথে সাথেই সে শয়তানী ধূম্রজালে আবেষ্টিত হয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ.

'নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট ও হারামও সুস্পষ্ট এবং এতদুভয়ের মাঝে সন্দেহপূর্ণ অনেক বিষয় রয়েছে, যা বহু মানুষ জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, সে তার ধর্ম ও সম্ভ্রমকে বাঁচাতে পারল। আর যে সন্দেহে পতিত হ'ল, সে যেন হারামেই পতিত হ'ল। যেমন সীমান্তের পার্শ্বে পশুচারণের সীমাতিক্রমের সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশারই নির্ধারিত সীমা আছে এবং আল্লাহ্র সীমারেখা হ'ল আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখ! শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যখন সেটি সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে এবং যখন তাতে বিকৃতি ঘটে তখন তার সমস্ত শরীরই গোলযোগ করে, আর সেটি হ'ল মানুষের হৃদয়' *(বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/৪১৭৮)*।

ঘ. শয়তানের সবচেয়ে বড় ধূম্রজাল হ'ল কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা :

এর মাধ্যমে শয়তান সহজেই আদম সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। ফলে আদম সন্তান মহা বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে আদম সন্তান আল্লাহদ্রোহী কথাবার্তা বলে, অশ্লীলতার পথ বেছে নেয়। বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা সহ কোন হারাম কাজই বাকী থাকে না, যা সে সম্পাদন করে। যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা জান না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়' *(বাক্বারাহ ২/১৬৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিহ্বা ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানের হিফাযতের দায়িত্ব নিবে জান্নাতের বিষয়ে আমি তার দায়িত্ব নিব' *(বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২)*।

ঙ. শয়তান মানুষকে অন্যায়-অশ্লীল কাজের হুকুম করে এবং অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হ'তে পারতে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (নূর ২৪/২১)।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এক লোককে হাযির করা হ'ল, যে মদ্যপান করেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাকে প্রহার কর। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাদের কেউ তার হাতযোগে তাকে প্রহার করল। কেউ জুতাপেটা করল, কেউ কাপড় দ্বারা আঘাত করল। যখন প্রহারের পালা শেষ হ'ল, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন'। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা এরূপ কথা বল না; শয়তানকে তার উপর সহায়তা করতে দিও না' *(বুখারী হা/৬৭৭৭)*।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

[লেখক : বি.এ অনার্স; তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-অনুবাদক : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

*[**লেখক পরিচিতি :** শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ছিলেন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত এক ইসলামী ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ জ্ঞান, অনন্য প্রজ্ঞা, পরিপূর্ণ ইখলাছ ও আল্লাহভীতি, সুন্নাতে রাসূলের অকৃত্রিম অনুসরণ, চমৎকার আচার-ব্যবহার, উন্নত গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী, শিরক, কুফর, ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীন বীর সিপাহসালার, তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র অতন্দ্রপ্রহরী এক অকুতভয় দাঈ, মুবাল্লিগ ও অসাধারণ মু'আল্লিম হিসাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে খুবই সমাদৃত ও উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। ইসলাম বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও কূট-কৌশল মোকাবেলায় তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সঠিক দিক নির্দেশনার কাছে মুসলিম বিশ্ব যুগ যুগ ধরে ঋণী হয়ে থাকবে। ইখলাছের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার নিমিত্তে কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে বর্ণিত খাঁটি ইসলামী আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে তিনি আমৃত কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল আযীয। তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন ৪র্থ পিতামহ 'বায'-এর নামানুসারে সারা বিশ্বে 'বিন বায' নামে পরিচিত। মাত্র ২০ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেলেও প্রখর মেধাশক্তির কারণে লেখাপড়ার কোন সমস্যা হয়নি। তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিম কয়েকবার খতম করেন। এতদ্ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহ্‌র অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ এবং মুসনাদে আহমাদ ও দায়েমীর বেশীর ভাগ অংশই অধ্যয়ন করেন।*

তিনি ২৭ বছর বয়সে রিয়াদের অদূরে আল-খারজ এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর দক্ষতার সাথে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৩৮০ হিজরীতে যখন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শায়খ বিন বায (রহঃ) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৩৯০ হিজরী সনে চ্যান্সেলর শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তিনি চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৩৯৫ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি এই পদেই বহাল থাকেন। ঐ বৎসরই রাজকীয় এক ফরমানের অধীনে তাঁকে মন্ত্রী পদমর্যাদায় 'ইসলামী গবেষণা, ফাতাওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ' (দারুল ইফতা) নামক সঊদী আরবের সর্বোচ্চ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পূর্ণ নিষ্ঠা, আমানতদারিতা ও সাফল্যের সাথে এই মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অতঃপর ১৯৯৯ সালের ১৩ই মে বৃহস্পতিবার রাত ৩-টায় তায়েফের বাদশা ফায়ছাল হাসপাতালে ৮৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ছেলে আহমাদ ইবনু বায (রহঃ) মৃত্যুকালীন স্মৃতিচারণ করেন এভাবে- 'যে রাতে তাঁর পিতা মারা যান, সে রাতেও তিনি প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত মেযাযে নিয়ে ফাতাওয়া প্রদানের জন্য বসেছিলেন। তিনি নিজে ফোনে বিভিন্ন জনের সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছিলেন'। অতঃপর মৃত্যুর পর তাঁর লাশ দাফনের জন্য মক্কায় নিয়ে আসা হয় এবং ১৪২০ হিজরীর ২৮ মুহাররম বাদ জুম'আ পবিত্র কা'বা চত্বরে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গসহ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শোকবিহ্বল মুছল্লী উক্ত জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!!]

ভূমিকা :

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর (ছাঃ)। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীবৃন্দের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে তাদের উপর।

(হামদ ও ছানার পর) অতঃপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজের একটি হ'ল, সৎপথের উপদেশ ও এ পথে আহ্বান জানানো। হক্বের উপর ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকার উপদেশ দেওয়া এবং এর বিপরীতে বাতিল থেকে সতর্ক করা, যেখানে আল্লাহ্‌র ক্রোধ রয়েছে, রহমত নেই। আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের অন্তর, আমল ও সমস্ত মুসলিমদের সংশোধন করে দেন। তিনি যেন আমাদের দ্বীনের বুঝ ও তাঁর উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করেন। তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং তাঁর বাণীকে সমুন্নত করেন। আর সামগ্রিক বিষয়ে মুসলিম নেতাদের সংশোধন করে দেন। তাদের ভাল কাজ করার তাওফীক্ব দেন। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংশোধন করে দেন। তাদের দেশ ও প্রজাদের কল্যাণে কৃত প্রত্যেক কাজে সহযোগিতা করেন। তাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন এবং শরী'আত বাস্তবায়নে তাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন, তার উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করেন। নিশ্চয় তিনি এ সকল কিছুর অভিভাবক ও এর উপর ক্ষমতাবান।

হে মুসলিমগণ! (জেনে রাখ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর মধ্যেই জাতির কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত আছে। আর এতে অবহেলায় রয়েছে বড় বিপদ ও বিপর্যয়। এর গুরুত্ব চেপে রাখা ও এ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা মহাপাপ।

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মর্যাদা অসীম বলে আলোকপাত করেছেন। এমনকি তিনি কিছু কিছু আয়াতে একে ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। অথচ ঈমান হ'ল দ্বীনের মূলনীতি ও ইসলামের মূলভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

আমরা আলোচ্য ভূমিকায় লুক্বায়িত রহস্য 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের' মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবশ্যকতা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। বিশেষ করে এ যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরক, বিদ'আত সহ বিভিন্ন পাপাচার বৃদ্ধির দরুণ মুসলিমদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্বারোপ প্রকট আকার ধারণ করেছে।

মুসলিমরা রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের যুগে এ আবশ্যকীয় বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একে উত্তমভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। এরপর অধিক মূর্খতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষের উদাসীনতা প্রকাশের দরুণ এর প্রয়োজনীয়তা আরো প্রকট হয়েছে।

অতঃপর আমাদের এ যুগে অধিকাংশ দেশে মন্দ-পাপাচার, বিশৃঙ্খলা-হানাহানি ছড়িয়ে পড়া এবং ভ্রান্ত পথের দাঈ বৃদ্ধি ও সঠিক পথের দাঈ হ্রাস পাওয়ার কারণে এ দাওয়াতী কাজ আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ জন্য মহান আল্লাহ দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং দাওয়াতের বর্ণনা ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরা উত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণে বের করা হয়েছে...' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ এখানে উম্মত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাই উত্তম জাতি ও আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয়। হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমরাই উম্মতকে সত্তরে পূর্ণতাদানকারী এবং তোমরাই আল্লাহ্‌র নিকটে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সম্মানিত' *(ইবনু মাজাহ, বাহায বিন হাকীম তার পিতা থেকে তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হা/৪২৮৮ 'যুহুদ' অধ্যায়-৩৪; মুসনাদে আহমাদ ৪/৪৪৭, ৫/৫)*।

আল্লাহ রাসূলগণকে কেন প্রেরণ করেছিলেন?

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মাঝেও চালু ছিল। এ দাওয়াত নিয়েই মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

-المعروف তথা 'সৎ কাজের' মূল হ'ল- আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা প্রকাশ করা।

-المنكر তথা 'অন্যায় কাজের' মূল হ'ল- আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

সকল রাসূলগণকে আল্লাহ্‌র একত্বের দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা সবচেয়ে বড় সৎকাজ। মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা থেকে নিষেধ করার জন্য, যা সবচেয়ে বড় অন্যায় কাজ। আর বানী ইসরাঈল দাওয়াতী কাজে সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা করেছিল এ জন্য তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়াম তনয় ঈসা (আঃ)-এর মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত' *(মায়েদা ৫/৭৮)*। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ অবাধ্যতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি বলেন, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 'তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল' *(মায়েদা ৫/৭৯)*।

অতএব বুঝা গেল, তাদের দাওয়াত না দেওয়াটাই ছিল তাদের বড় অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন। যার তাফসীর করা হয়েছে নিম্নোক্ত এ আয়াত দ্বারা। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ- كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ 'এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত' *(মায়েদা ৫/৭৮-৭৯)*।

এ বিধান কেবল দাওয়াতের মত আবশ্যকীয় কাজটি ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতাকেই নির্দেশ করে। আর আল্লাহ তা'আলা এ জাতিসমূহের মধ্যে যাদের প্রশংসা করেছেন তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ- يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ- وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

'আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়, অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হ'ল সৎকর্মশীল। তারা যেসব করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদের বিষয়ে অবগত' *(আলে ইমরান ৩/১১৩-১১৫)*।

আহলে কিতাবদের মধ্যে এরা ঐ সকল লোক, যাদের উপর ধ্বংসপ্রাপ্তদের মত কিছু আপতিত হয়নি। একারণেই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার অপর এক আয়াতে ছালাত ও যাকাতের পূর্বে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের যে বিধান উল্লেখ করেছেন, তা কেবল এর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান আগে আনার তাৎপর্য কী?

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান ফরযে কেফায়া। তারপরও আল্লাহ এই আয়াতে ছালাত ও যাকাতের পূর্বে একে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

‘ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে, এদের উপর আল্লাহ তা‘আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়’ *(তওবা ৯/৭১)*।

এখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধানকে ছালাত প্রতিষ্ঠার বিধানের আগে আনা হয়েছে। অথচ ছালাত ইসলামের খুঁটি এবং কালেমায়ে শাহাদতের পর সবচেয়ে বড় একটি রুকন। তারপরও এ বিধানকে আগে আনার তাৎপর্য কী?

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এর তাৎপর্য ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করেই একে আগে আনা হয়েছে। কেননা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে জাতীয় কল্যাণ। ফলে জাতির কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে, মর্যাদা-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে, অপকর্ম-পাপাচার কমে যাবে। এর অধিবাসীরা একে অপরকে ভাল কাজে সহযোগিতা করবে এবং তারা একে অপরকে সৎকাজের উপদেশ দিবে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। সর্বোপরি তারা সকল ভাল কাজ গ্রহণ করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ বর্জন করবে।

পক্ষান্তরে বিরোধীতা ও অগ্রাহ্য করার কারণে বড় বিপর্যয় নেমে আসবে, অন্যায়-অবিচার বৃদ্ধি পাবে, জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়বে অথবা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সর্বত্র অন্যায়-অবিচার প্রকাশ পাবে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে, জাতির মর্যাদা কমে যাবে, হক্ব পদদলিত হবে এবং বাতিলের আওয়াজ উঁচু হবে। আর এই বাস্তবতাই দেখা দিবে প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি শহরে, জনপদে এবং প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে। যেখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বাস্তবায়ন নেই। তাই আজ এখানে-সেখানে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র যুলুম, অন্যায়, বিশৃঙ্খলা ছেয়ে ফেলেছে *(ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়তা ইল্লাবিল্লাহ)*।

রহমতর প্রত্যাশী :

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারী, ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগতরাই রহমত প্রাপ্তদল। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ‘তারা ঐ সকল লোক, যাদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন’ *(তওবা ৯/৭১)*।

অতএব এ আয়াত প্রমাণ করে একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য ও শীর‘আতের অসুরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্র রহমত অর্জন সম্ভব। বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মাধ্যমে। আল্লাহ্র রহমত খেয়ালখুশী আর বংশমর্যাদা দ্বারা অর্জিত হয় না। যেমন বনু কুরায়শ, বনু হাশিম অথবা অমুক বংশ ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত হয় না।

বড় কোন পদমর্যাদা দ্বারাও রহমত অর্জন করা যায় না। যেমন প্রধামমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট বা সরকারী উচ্চপদস্ত কোন মন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে রহমত অর্জন সম্ভব না। একইভাবে সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারাও রহমত অর্জন সম্ভব না। এমনকি বেশী বেশী শিল্প কারখানা থাকার দ্বারা রহমত অর্জন সম্ভব না। এছাড়া মানুষের উন্নয়নমুখী অন্যান্য কর্মকাণ্ডের দ্বারাও এ রহমত অর্জন করা যায় না। রহমত কেবল আল্লাহ, রাসূল এবং তাঁর শরী‘আতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

তাছাড়া আল্লাহ্র রহমত লাভের অন্যতম মাধ্যম হ’ল- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা। আর এ সকল লোকই হচ্ছে প্রকৃত রহমতের অংশীদার, যারা মন থেকে আল্লাহ্র রহমত কামনা করে, যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে চলে, সে সবচেয়ে বড় যালিম। যতই সে ধারণা করুক যে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর কাছে আশাবাদী।

আসলে যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে সম্মান করে, তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর নিকট আশাবাদী সে তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করে, তাঁর শরী‘আত মেনে চলে, তাঁর পথে জিহাদ করে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে তারা আল্লাহ্র রতমতের প্রত্যাশী’ *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা যারা ঈমান এনেছে, তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং তাঁর জন্য হিজরত করেছে তাদেরকে ঈমান, হিজরত ও জিহাদের কারণে রহমত প্রত্যাশী বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে এটা বলা হয়নি যে, যারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেছে অথবা যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হয়েছে, বিভিন্ন রকম লাভজনক কর্মকাণ্ড করেছে অথবা যদের বংশ পরিচয় সম্ভ্রান্ত কিংবা যারা আল্লাহ্র রহমত প্রত্যাশী! বরং তিনি বলেছেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশা এবং তাঁর আযাবের ভয় কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে হ’তে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে।

Contents

তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা উচিত :

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারীদের এ মহৎ কাজকে 'সফলতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকাজের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করেছেন যে, এরা ঐ সকল লোক, যাদের মধ্যে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো, সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার মত গুণাবলী থাকবে। এরাই হ'ল সফলকাম। অর্থাৎ এ সকল লোকই হচ্ছে পরিপূর্ণ সফলকাম। যদিও আরো অনেক সফলকাম মুমিন ব্যক্তি আছেন, যারা শারঈ ওযর থাকার কারণে এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কিছু কিছু পালন করতে পারে না। তবে পূর্ণাঙ্গ সফলকাম মুমিন তারাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং নিজেরাও সেদিকে অগ্রসর হয়। তারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। অতঃপর যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে দুনিয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেমন- লোক দেখানো, সুনাম খ্যাতি অর্জন করা অথবা তড়িৎ কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য অথবা অন্য কিছু। আর যারা সৎ কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে তারাই হচ্ছে মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং পরিণামের দিক দিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার লোক।

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, আপনার এ অবস্থা কেন? আপনি কী আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম' *(বুখারী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

যারা কথা অনুযায়ী কাজ করে না তাদের জন্য এ অবস্থা। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে এহেন অবস্থা থেকে পানাহ চাচ্ছি। তাদের জন্য আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে, তাদেরকে জনসম্মুখে তুলে ধরা হবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তাদের শাস্তি অবলোকন করবে এবং তাদের আগুনে নিক্ষেপ হওয়া দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে বলবে, তাদের কী কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হ'ল? তারা জাহান্নামে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে বোঝা নিয়ে গাধা ঘুরাঘুরি করে। তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। আর তাকে টানা হেঁচড়া-ই বা করা হবে কেন?

জবাব : কেননা তারা সৎকাজের আদেশ করত, কিন্তু নিজেই তা করত না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত, কিন্তু নিজেই আবার তা করত।

সুতরাং এখান থেকে বুঝা গেল, সৎকাজের আদেশের দ্বারা উদ্দেশ্য, মানুষকে সৎকাজের উপদেশের পাশাপাশি নিজেও তা পালন করা। মানুষকে অসৎকাজে নিষেধ করার সাথে নিজেও তা পরিত্যাগ করা। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। এই মহা আবশ্যকীয় কাজটিকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন এবং সেদিকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যারা তা ছেড়ে দিবে তাদের সতর্ক ও অভিস্পাত করেছেন।

অতএব মুসলিমদের জন্য যরূরী হ'ল- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেদিকেই অগ্রসর হওয়া। আর এক্ষেত্রে তার প্রতিপালকের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক থাকা।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের স্তর :

রাসূল (ছাঃ) থেকে এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা এ বিষয়টিকে আরো সুন্দর ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. 'তোমাদের যেকেউ কোন অপসন্দনীয় (কথা বা কর্ম) দেখলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। (হাত দ্বারা বাধা প্রদান) সম্ভব না হ'লে যেন কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হ'লে সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আর এটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০১৩; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। এ হাদীছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ৩টি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

১ম স্তর : সামর্থ্য অনুযায়ী হাত দ্বারা বাধা দেওয়া। মদের ভাণ্ডগুলো ভেঙ্গে ফেলা, খেল-তামাশার যন্ত্রগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া। আর যারা মানুষের অনিষ্টের ইচ্ছা করে, নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের উপর যুলুম করে, সামর্থ্য থাকলে তাদেরকে হাত দ্বারা প্রতিহত করা। যেমনটা বাদশা বা তাদের সমপর্যায়ের সামর্থ্যবান লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা মানুষকে ছালাতে বাধ্য করা, আল্লাহ্‌র আবশ্যকীয় হুকুম-আহকামের অনুসরণে বাধ্য করার পাশাপাশি অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোতেও সামর্থ্য থাকলে বাধ্য করা। এভাবেই একজন

মুমিনের উপর তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের আদেশ করা এবং তাঁর হারামকৃত বিষয় থেকে হাত দ্বারা বাধা দেওয়া যরূরী। যখন তাদের মধ্যে শুধু মুখের বলায় কোন উপকার হবে না।

একইভাবে কেউ যদি আমীর অথবা তার অধীনস্ত কারো পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব পায় অথবা গোত্রীয় নেতাদের মত কেউ যাদের বাদশাহ বা তার দলের পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব দেওয়া আছে তাদের যদি সাধারণ রাজকর্মকর্তাদের অবর্তমানে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহ'লে তারা এই আবশ্যকীয় বিষয়টি সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করবে।

২য় স্তর : মুখের দ্বারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। যেমন একথা বলা যে, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। হে আমার ভাই! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ছালাত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর, সব ধরনের অসৎ কাজ পরিত্যাগ কর, এভাবে এভাবে কাজ কর, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ছেড়ে দাও, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর, নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার কর ইত্যাদি। তারা তাদের মুখ দ্বারা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে সৎ পরামর্শ ও সৎ উপদেশ দিবে। আর তারা যেসব অসৎ কাজ করত তা থেকে বিরত রাখবে এবং সতর্ক করবে। তাদের সাথে কোমলতা ও সহনশীলতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ 'নিশ্চয় আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা পসন্দ করেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৬০২৪; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮৪ 'কিতাবুল বিরবি ওয়াছ-ছিলাহ' অধ্যায়-৩; মিশকাত হা/৪৬৩৮)*।

'একদা ইহূদীদের একদল রাসূলের নিকট আসল এবং বলল, 'আস-সামু আলাইকুম ইয়া মুহাম্মাদ'। এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য মৃত্যু ছিল, শান্তি বর্ষিত হওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। এ কথা আয়েশা (রাঃ) শুনে বললেন, বরং তোমাদেরই শীঘ্রই মৃত্যু হোক এবং আল্লাহ্র অভিশাপ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ তোমাদের উপর অভিসম্পাত করুন, তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হোন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, থাম হে আয়েশা! আল্লাহ সহনশীল, তিনি প্রত্যেক কাজে সহনশীলতা ও কোমলতাকেই পসন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছিল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, কেন তুমি কি শুননি তাদের জবাবে আমি কি বলেছিলাম? আমিতো তাদের জবাবে 'ওয়ালাইকুম' বলেছি। (শুন) তাদের ব্যাপারে আমাদের দো'আ কবুল হবে, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের দো'আ কবুল হবে না' *(ছহীহ বুখারী হা/৬৪০১; মিশকাত হা/৪৬৩৮ 'সালাম' অধ্যায়-৪)*।

এখানে ইহূদীদের সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সৌহার্দপূর্ণ ও সহনশীল আচরণ করলেন, যাতে তারা হেদায়াত গ্রহণ করে, সত্যের পথে চলে এবং ঈমানের পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়। এটাই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের যথাযোগ্য পন্থা। যাতে সহনশীলতা ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণে চাহিদামাফিক বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ পাবে। আর কোন জনসভা, রাস্তা বা অন্য কোথাও কেউ যদি অসৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে, তাহ'লে তাদেরকে সহনশীল ও উত্তম বাক্যালাপের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। যদি ছোট বা বড় বিষয়ে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হয় তাহ'লে সে উত্তমভাবে তাদের সাথে বিতর্ক করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তোমরা তোমাদের প্রভুর পথে মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে আহ্বান কর। আর তাদের সাথে (প্রয়োজনে) উত্তমভাবে বিতর্ক কর' *(নাহল ১৬/১২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*।

আহলে কিতাব কারা?

তারা হ'ল ইহূদী-খ্রীষ্টান ও কাফেরগণ। এ সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 'তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*।

এর অর্থ হ'ল তাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে, রাগারাগি করেছে ও অসৎ বাক্যালাপ করে তাদের সাথে বাক-বিতণ্ডা ছাড়া উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا 'মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই' *(শূরা ৪২/৪০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 'বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৪)*। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া ও সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা উত্তম পন্থায় হবে। কেননা এটাই কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, একজন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারীর জন্য যরূরী হ'ল, সে যে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করছে তাতে সে সহনশীলতা, কোমলতা ও ন্যায়-ইনছাফপরায়ণতা দেখাবে। যে বিষয়ে সে কাউকে আদেশ করবে সে বিষয়ে তার পূর্ণ জ্ঞান থাকবে এবং যা থেকে নিষেধ করছে সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকবে।

এটাই পূর্ববর্তী সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যের সারকথা। সহনশীলতা, কোমলতা পাশাপাশি তার মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও থাকা চাই। সে জ্ঞান ছাড়া অজ্ঞতার সাথে কাউকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে না। সাথে সাথে আহূত বিষয়ে সে নিজে সহনশীল ও আমলকারী হবে। নিষেধকৃত বিষয়টি নিজে বর্জন করবে, এমনকি এ বিষয়ে সে অনুসৃত ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

ছহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বরাতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

‘আল্লাহ তা‘আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই উম্মতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে[২১], যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত ন। আর সে সব কর্ম তারা করত; যার জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথার দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট নেই’ *(ছহীহ মুসলিম হা/১৮৮ ‘ঈমান’ অধ্যায়-২০; মিশকাত হা/১৫৭)*।

এই হাদীছটি পূর্ববর্তী আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। এই দুই হাদীছেই প্রথমে হাত দ্বারা বাধা দেওয়া তারপর মুখ অতঃপর অন্তরের ঘৃণা দ্বারা বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর যারা নবীদের পর তাদের উত্তরসূরি হয়েছে তাদের জাতির কাছে তাদের দায়িত্ব হ’ল, তারা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন তারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, অতঃপর মুখ দ্বারা অতঃপর অন্তর দ্বারা ঘৃণা করার মাধ্যমে জিহাদ করবে।

এভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরও একই বিধান। তাদের আলেম বা আমীর-নেতা ও তাদের সহযোগী এবং তাদের ফুকাহায়ে কেরাম আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সাথে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, জাহেলকে শিক্ষা দেওয়া, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানো, হদ প্রতিষ্ঠা করা, শারঈ বিচার-আচারের ব্যবস্থা করা। যাতে মানুষেরা সঠিক পথে চলে এবং সত্যকে গ্রহণ করে নেয় এবং তারা তাদের মাঝে শারঈ হদের বিধান প্রতিষ্ঠা করবে ও তাদেরকে আল্লাহ্র সীমারেখা অতিক্রম করা থেকে বাধা দেওয়াও তাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য।

এ ব্যাপারে খলীফা ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে একটি কথা সুসাব্যস্ত আছে যে, إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ‘আল্লাহ কুরআনের চেয়ে শাসকের (কঠোরতার) মাধ্যমে মানুষকে বেশী অন্যায়-পাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন’। এ ধরণের উক্তি ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

এ কথা সত্য যে, অধিকাংশ মানুষকে যদি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের উপর আমল করতে বলেন, তারা তা মানবে না। কিন্তু শাসক যদি প্রহার ও জেল জরিমানার মাধ্যমে এধরনের কোন আমল করায় বাধ্য করে তাহ’লে সহজেই মানুষ তা মেনে নেয় এবং অন্যায়কে ছেড়ে দেয়... কিন্তু কেন? কেননা তার অন্তরটা ব্যাধিগ্রস্ত, সে দুর্বল ঈমানের অধিকারী অথবা তার ঈমান শূন্যের কোঠায়...। এ কারণে কুরআন-হাদীছ তার উপর কোন প্রভাব ফেলে না...। কিন্তু শাসককে ভয় করার কারণে ও তার উপর হদ কায়েমের ভয়ে সে পাপকাজ থেকে ফিরে আসেম এক্ষেত্রে তার উপর শাসকের বড় প্রভাব থাকে।

এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য ক্বিছাছ, হদ ও বিচারকার্যের বিধান দিয়েছেন। যেন সে অন্যায় থেকে ফিরে আসে, যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত হয়। আর এভাবেই আল্লাহ হক্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাই নেতাদের জন্য যরূরী হ’ল, তারা এ বিধানগুলো কায়েম করবে, যারা এগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে তাদের সাহায্য করবে, তাদের জন্য হক্বকে অবধারিত করে দিবে, নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থামিয়ে দেবে, যাতে তারা ধ্বংস না হয়, অন্যায়-অপকর্মের স্রোতধারায় ভেসে না চলে, শয়তানের সহযোগী না হয় এবং আমাদের বিপক্ষে শয়তানের সৈন্যে পরিণত না হয়।

৩য় স্তর :

যখন কোন মুমিন হাত ও মুখ দ্বারা অন্যায় কাজে বাধা দিতে অক্ষম হবে, তখন সে অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ করবে। সে অন্তর থেকে সেই অসৎ কাজকে অপসন্দ করবে, ঘৃণা করবে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তাকে কিছু লোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, هلكت ان لم امر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال له رضي الله عنه-هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ‘আমি যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করি, তবে ধ্বংস হয়ে যাব’। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তখনই ধ্বংস হবে, যদি তোমার অন্তর সৎ কাজকে মেনে না নেয় এবং অন্যায় কাজকে অপসন্দ না করে’।

[চলবে]

[লেখক : তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

২১. خلوف শব্দটি خاء অক্ষরে পেশ দিয়ে। যা خلف এর বহুবচন। যেমন ভাষাবিদরা বলে থাকেন, অমুক অমুকের পশ্চাদে এসেছে, যখন সে কারো পরে আসে। কিন্তু শব্দটি خاء বর্ণে (خَلَف) যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে خالف بخير অর্থাৎ সৎপথের পশ্চাদগামী। সম্ভাব্য আরেকটি অর্থ হ’ল (خلف) অর্থাৎ মানুষের পশ্চাদগামী। যেমন সূরা মারইয়ামের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

ছিয়াম ও বিজ্ঞান

-অধ্যাপক আকবার হোসাইন

ভূমিকা :

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। আর উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। ইসলামেও তার অনুসারীদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী রয়েছে। রামাযানের ছিয়াম সাধনা তার মধ্যে অন্যতম। মানব শিশু সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল প্রতিটি শিশু নিষ্পাপ ও মুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক সন্তান ইসলামী ফিতৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহূদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)*।

মানুষের দ্বারা অন্যায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতঃপর ত্রুটি-বিচ্যুতির পর তওবা করলে এবং তা পুনরাবৃত্তি না ঘটলে পূর্বে কৃত অপরাধের জন্য সে আর শাস্তিযোগ্য অপরাধী থাকে না। ইসলামের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্বাভাবিক পথে প্রত্যাবর্তন করতে সহায়তা করে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

মানুষের সহজ প্রত্যাবর্তনের জন্য সর্বদা সুযোগ থাকলেও আল্লাহ তা'আলা কিছু সময়ে বিশেষ সুযোগের দ্বার অবারিত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে রামাযান মাসের ছিয়াম অন্যতম। নিম্নে 'ছিয়াম বনাম বিজ্ঞান' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল :

ছিয়ামের পরিচয় :

صيام শব্দটি বাবে نصر–ينصر এর মাছদার। এর আভিধানিক অর্থ الامساك عن اي شيئ كان 'যে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা'। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন, وهو الامساك عن الاكل و الشرب و الجماع من الصبح إلي المغرب مع النية 'নিয়তের সাথে ছুবহে ছাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকাকে ছিয়াম বলা হয়'।

রামাযানের ছিয়াম : শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

ইসলামে ছিয়ামের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে কতগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন-

১. তাক্বওয়া :

ত্রিশ দিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা প্রকৃত অর্থে তাক্বওয়াবান হয়ে উঠে। তাক্বওয়া (تقوي) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীতি, পরহেযগারিতা অবলম্বন ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মহান আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলার নাম তাক্বওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ও পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক এই তাক্বওয়া। তাই মহান আল্লাহ্র ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা, তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও পাকড়াওয়ের কথা মনে করা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাক্বওয়াবান বানানোর জন্য ছিয়ামের মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাক্বওয়াশীল হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

তাক্বওয়া মানুষের যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সৎ পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ্র কাছে তাক্বওয়াবান মানুষ অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

২. পাপ মোচনের মাধ্যম :

نسي শব্দ থেকে إنسان শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হ'ল ভুলে যাওয়া। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে পরিচালনার জন্য যুগে-যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। গাইড বুক হিসাবে নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব সমূহ। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন কুরআন, কিন্তু মানুষ আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে অমান্য করার ফলে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু সময় নির্ধারণ করেন। রামাযানের ছিয়াম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় ছিয়াম সাধনা করে এর বিনিময় স্বরূপ তার অতীত জীবনের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে রামাযান মাসের রাতে তারাবীহর ছালাত আদায় করে, তার অতীত জীবনের যাবতীয় অন্যায়গুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরের মধ্যে

ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের সাথে ইবাদত করবে এর বিনিময় স্বরূপ তার অতীতের গুনাহগুলো মার্জনা করে দেয়া হয় *(মুত্তাফাক্ব 'আলাহই, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

৩. ছিয়াম শয়তানের হামলা থেকে ঢালস্বরূপ :

মুমিন বান্দা যখন ছিয়াম সাধনা করে তখন ছিয়ামই তাকে সকল প্রকার পাপাচার থেকে হেফাযত করে। যেমন যুদ্ধের ময়দানে সেনাবাহিনী প্রতিপক্ষের হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল ব্যবহার করে থাকে। এমর্মে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ 'ছিয়াম বান্দাহ্র জন্য জাহান্নাম হ'তে বাঁচার ঢালস্বরূপ' *(বুখারী হা/১৮৯৪; মুসলিম হা/২৭৬১)*। অন্যত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَت الشَّيَاطِينُ 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়' *(ছহীহ বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬)*।

৪. কুরআন তেলাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করে :

আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মর্যাদা এবং তেলাওয়াতকারীর মর্যাদা এমনিই পৃথিবীর অন্য সকল গ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রম। কুরআন তেলাওয়াত করলে ছাওয়াব, কুরআন অধ্যয়ন করলে ছাওয়াব, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে ছাওয়াব, ক্রয় করে ছাদাক্বা করলে ছাওয়াব এবং অপরকে কুরআন শিক্ষা দিলে ছাওয়াব হয়। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হ/২১০৯)*।

রামাযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'রামায়ান সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের হেদায়াত ও হেদায়াতের জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রামাযান মাসের প্রত্যেক রাতেই জিবরীল (আঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন *(বুখারী হাদীস হা/৬; মুসলিম হা/২৩০৮)*। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছিয়াম এবং কুরআন আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্য (ক্বিয়ামতের দিন) সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় তার খানা ও প্রবৃত্তি হ'তে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অন্যদিকে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হ'তে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, আলবানী তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৯৬৩)*। অতএব রামাযানের এই পবিত্র মাসে ছিয়াম পালনের পাশাপাশি প্রত্যেকের উচিত অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া।

৫. ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা :

বর্তমানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোথাও ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করাটাই বড় ধরনের অন্যায়। আমরা যে যেখানে দায়িত্বে আছি সেখানে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি একেবারে হালকা মনে করে থাকি। আর হালকা মনে করার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যায়ের সেঞ্চুরি হ'তে দেখা যায়। দেখা যায় পরিবারের প্রধান তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ইনছাফের ভিত্তিতে আচরণ এবং সম্পদের মালিকানা বণ্টন করেন না। এরূপভাবে অফিস প্রধান কিংবা বিভিন্ন সেক্টরের প্রধানগণ, রাষ্ট্রের প্রধান, সংগঠনের প্রধান তাদের অধীনস্থদের সাথে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আচরণ করেন না। অতএব এ অবস্থা উত্তরণের জন্য মাহে রামাযানের ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ) ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সাহারী, ইফতার, ছালাতের সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করে ইনছাফের মৌলিক শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِى خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) সেই যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে বড় হয়েছে (৩) যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র জন্য উভয় মিলিত হয় এবং তার জন্যই পৃথক হয়ে যায় (৫) এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে। (৬) এমন ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে রামাযানে ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে উল্লেখিত হাদীছের সকল গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র ছায়ায় স্থান লাভ করার তাওফীক দিন-আমীন!!

৬. মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে :

গোটা একমাস ছিয়ামের প্রশিক্ষণ, যথাসময়ে সাহারী, ইফতার, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতসহ তারাবীহর ছালাত, পূর্ণ এক ছা' ফিৎরা, যাকাত প্রদান ইত্যাদি যথানিয়মে সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে মানোন্নয়ন করে খাঁটি মুমিন হ'তে ছিয়াম সরাসরি ভূমিকা রাখে। অহি-র বিধানের উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে যায় যেন কোন প্রকার পরীক্ষা, অত্যাচার, নির্যাতন, হামলা, মামলা, গুম, খুন ইত্যাদি তার ঈমান থেকে চুল পরিমাণ সরাতে পারে না। বরং এমন বালা-মুছীবত আসলে মুমিনগণ হাসিমুখে নবীগণের সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না, ঈমানদার হ'লে তোমরাই শ্রেষ্ঠ' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

৭. ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম্র স্বভাব গঠন করা যায়। ৮. ক্ষুধার যন্ত্রণা উপভোগের মাধ্যমে ছায়েমকে

দরদী, সংবেদনশীল ও সহমর্মী বানায়। ৯. ছিয়াম সাধনা বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার জন্ম দেয়। ১০. মানবতার চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়। ১১. ধূমপানসহ যাবতীয় মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। ১২. ছিয়াম জাতিকে শালীনতার সাথে পথ চলতে শিক্ষা দেয়। ১৩. ছিয়াম ও রামাযান শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

ছিয়ামের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা :

বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ঊষালগ্নে ছিয়াম সাধনা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে একটি বৈজ্ঞানিক অবদান না-কি আবেগপ্রবণ অন্ধবিশ্বাসের একটি প্রচলিত প্রথা, তা যাচাই করার সময় এসেছে। তাই বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানমনা অধিকাংশ মানুষ যারা রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, প্রশাসক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত এবং যাদের নেতৃত্বে সমাজ এবং দেশ পরিচালিত হয়, তাদেরকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে না বুঝালে যেন কিছুতেই আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায় না। তাই ছিয়ামের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। নিম্নে ছিয়ামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হ'ল-

মানব জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতগুলো আদেশ দান করেছেন তার মধ্যে ছিয়াম অন্যতম। কোন কোম্পানি যখন কোন বস্তু আবিষ্কার করে তখন তার সাথে একটি গাইড বুক দিয়ে দেয়। কোথায় ফুয়েল দিতে হবে, কোথায় পানি বা মবিল দিতে হবে, কত কিঃ মিঃ চলার পর সার্ভিসিং করতে হবে তা একমাত্র কোম্পানিই ভালো জানে। কেউ যদি কোম্পানির নির্দেশাবলী অমান্য করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যবহার করে তাহ'লে দুর্ঘটনা বা Accident অনিবার্য। তদ্রূপ আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহপাকই ভালো জানেন কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানুষের শরীর এবং মন সুস্থ থাকবে। প্রতিটি দামী যন্ত্রপাতি যেমন মাঝে মাঝে সার্ভিসিং করা প্রয়োজন তেমনি মানব দেহের কলকব্জা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মাঝে মাঝে সার্ভিসিং করা প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডাঃ হেপোক্রেটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন, 'The more you nourish a diseased body the worse you make it'. অর্থাৎ 'অসুস্থ দেহে যতই খাদ্য দিবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে'। সমস্ত দেহে সারা বছরে যে জৈব বিষ (Toxin) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার ফলে সে জৈব বিষ দূরীভূত হয়। তাছাড়া মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ছিয়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেকের ধারণা ছিয়াম রাখার ফলে শরীর ও স্বাস্থ্যের বহু ক্ষতি সাধিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞান এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে যে, ছিয়াম পালনে স্বাস্থ্যহানী তো ঘটেই না, বরং স্বাস্থ্যের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। যেমন-

(ক) পাকস্থলী একটি স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন। যার ভিতর বিভিন্ন ধরনের খাবার অনায়াসে হজম হয়। পাকস্থলী শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সার্বক্ষণিক সক্রিয় রাখে। তাছাড়া স্নায়ু-চাপ এবং খারাপ খাদ্য গ্রহণের ফলে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়। আবার অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীর আয়তনও বেড়ে যায় এবং এই আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। Gastric Juice Analysis করে যে Acid Card পাওয়া যায় তাতে ছিয়াম কালীন পাকস্থলীর Acid সবচেয়ে কম থাকে। আমরা মনে করি ছিয়ামকালীন পাকস্থলীর Acidity সবচেয়ে বেশী থাকে এ ধারণা ভুল। ছিয়াম অবস্থায় পাকস্থলীর Acidity তুলনামূলক কম থাকে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মুয়াযেযম তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলেন, প্রায় ৮০% ছিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে Acidity স্বাভাবিক এবং ৩৬% ছিয়াম পালনকারীর অস্বাভাবিক Acidity স্বাভাবিক হয়েছে। ১২% ছিয়াম পালনকারীর Acidity বাড়লে তা ক্ষতিকর নয়। অতএব ছিয়ামের কারণে পেপটিক আলসার বাড়ে না বরং কমে।

(খ) যকৃত (Liver) মানব দেহের একটি বড় গ্রন্থি। যকৃতের ডান অংশের নিচে পিত্ত-থলি থাকে। লিভার কর্তৃক নিঃসৃত পিত্ত জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। লিভারের কার্যক্ষমতা কমে গেলে জণ্ডিস, লিভার সিরোসিসসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। স্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্ত-লবণ অংশ নেয়। তাছাড়াও Laxative কাজে অংশ নেয় এবং কলেষ্টরল লেসিথিন ও পিত্ত-রঞ্জক বস্তু দেহ হ'তে বর্জন করে। ছিয়াম পালন করার ফলে এই সমস্ত কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায় এবং সকল অঙ্গগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া একটি ইঞ্জিনের যেমন মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন তেমনি Liver নামক ইঞ্জিনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সুন্নাতে রাসুল (ছাঃ)' নামক বইতে এই বিশ্রামের সময়কাল কমপক্ষে এক মাস বলা হয়েছে।

(গ) Kidney শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। Kidney দেহে ছাকনি হিসাবে কাজ করে। যা রেচনযন্ত্র হিসাবে পরিচিত। কিডনি প্রতি মিনিটে ১ থেকে ৩ লিটার রক্ত সঞ্চালন করে এবং পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে। ছিয়াম পালনের কারণে রক্তে কোন অপদ্রব্য খাদ্যের মাধ্যমে আসে না কিন্তু তার রেচন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে পেশাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে, যার ফলে মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়।

(ঘ) মানব দেহে অতিরিক্ত চর্বি ও মেদ জমার ফলে রক্তে Cholesterol Level বেড়ে যায়। আর রক্তে স্বাভাবিক Cholesterol Level হ'ল ১২৫-২৫০ mg/ ১০০ml সিরাম (plasma)-এর বেশী হ'লে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্তথলিতে পাথর ইত্যাদি হয়। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মেদ কমে যায়। ফলে Cholesterol Level কমে যায় এবং সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

(ঙ) বর্তমানে ডায়াবেটিকের সাথে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই পরিচিত। বিশেষ করে ৪০ বছরের উর্ধ্বে ব্যক্তিরা এব্যাপারে খুবই শঙ্কিত। মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল অগ্ন্যাশয় বা Pancrease এর গ্রন্থি-রসে Insulin নামক এক প্রকার হরমোন তৈরি হয়। এই ইনসুলিন রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে এর Glycogen অণুকে দেহকোষে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আমরা প্রতিনিয়ত যা খাই তার মধ্যে Glycogen থাকে, যা হজমের পর রক্তে এবং Insulin এর সাহায্যে দেহ কোষে পৌঁছে যায়। তাই Insulin Secretion কম হ'লে এবং রক্তে Glycogen এর পরিমাণ বেশি হ'লে ডাইবেটিস হয়। কিন্তু ছিয়াম থাকার কারণে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে এবং গ্লুকোজ (Glycogen) তৈরি হয় না। পক্ষান্তরে Insulin তৈরি অব্যাহত থাকে। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী। দেহের কোষের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলো পূর্বের চেয়ে সংকুচিত হয়। ছিয়াম পালনের ফলে এই সমস্যা দূরীভূত হয়। তাছাড়া শরীরের বাড়তি মেদ জমাতে বাধাগ্রস্ত হয় এবং ক্যালরির অভাবে মেদ ক্ষয় হ'তে থাকে। সেক্ষেত্রে মোটা লোক তুলনামূলক স্লিম হয়ে যায়। তাই মোটা কমানোর জন্য ছিয়াম একটি নীরব থেরাপি টিপস। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, গর্দানের

কোষগ্রন্থি, লালা তৈরিকারী কোষগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয়ের কোষগ্রন্থি অধীর আগ্রহে রামাযান মাসের জন্য অপেক্ষা করে। আর এভাবেই ছিয়ামের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হয় এবং স্থূল শরীর ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

(চ) আল্লাহ পাকের অমোঘ সৃষ্টি হ'ল জিহ্বা এবং লালাগ্রন্থি। আমাদের জিহ্বার গোঁড়ায় Salivary gland বা লালা উৎপাদক গ্রন্থি থেকে যদি Salivage নামক এনজাইম বা থুথু না বের হ'ত, তাহ'লে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে ভিক্ষুক সকলেরই বুকে পানি ভর্তি কলস ঝুলিয়ে রাখা লাগত এবং চামচের সাহায্যে মাঝে মাঝে জিহ্বা ভিজানো লাগত। অন্যথায় জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তাই জিহ্বা মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বা না থাকলে আমরা খেতে পারতাম না। কথা বলতে পারতাম না। জিহ্বায় অসংখ্য কোষের সমষ্টি স্বাদ নালিকা রয়েছে। এগুলো দ্বারা খাবারের বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নালিকা চার ভাগ বিভক্ত। যথা- জিহ্বার গোঁড়ায় ঝাল মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, দু'পাশে নোনতা, টক ও কষ। জিহ্বার মাঝখানে স্বাদ নালিকা না থাকায় কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। ছিয়াম সাধনার ফলে ছিয়াম পালনকারীর জিহ্বা এবং লালাগ্রন্থিগুলো বিশ্রাম লাভ করে। যার ফলে জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ কণিকাগুলো সতেজতা ফিরে পায়। তাছাড়া ছিয়াম পালনের জন্য লালাগ্রন্থিগুলো থেকে বেশী বেশী রস নিঃসৃত হয়, ফলে ছিয়াম থাকার কারণে একদিকে যেমন রুচি বাড়ে, অন্য দিকে তেমনি হজম শক্তি বাড়ে।

(ছ) শারীরিক বিভিন্ন রোগব্যাধির উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটি বিরাট ভূমিকা আছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে মানসিক ব্যাধির কারণে মানুষ অনেক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এগুলোকে সাইকোমোসটিক (Pshycomostic) রোগ বলা হয়। যেমন- হাঁপানি, গ্যাস্ট্রিক আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, অনিয়মিত মাসিক প্রভৃতি। পরিবেশ এবং মানসিকতার প্রভাবে মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে, যা হ'তে পারে মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন অথবা পশুত্বে ভরপুর। আর এটা সমাজ এবং রাষ্ট্রকে করে প্রভাবান্বিত।

একমাস ছিয়াম সাধনার ফলে মানুষের মনের কালিমা দূর হয় এবং ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, সর্বত্র একটি পবিত্র মন এবং মানসিকতার বিকাশ ঘটে। তাই- The clinical History of Islam গ্রন্থে যথার্থ বলা হয়েছে যে, 'The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellent teaching for building a good moral character'. অর্থাৎ 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে ছিয়ামে রয়েছে চমৎকার অবদান'। তাছাড়া ছিয়াম মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে দেয়। কারণ Empty stomach is the power house of knowledge. অর্থাৎ 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের ভাণ্ডার'।

সুধী পাঠক! পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةَ. 'রামাযান মাসের প্রথম রাত আগমন করে, তখন শয়তান ও বিদ্রোহী জিনগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। যাতে করে ছিয়াম পালনকারীকে প্রতারণা করতে না পারে। আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয়। পুরো রামাযানে আর কোন দরজা খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাসমুহ খোলা রাখা হয়। কোন একটি দরজা বন্ধ করা হয় না। রামাযান মাসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়োজিত অদৃশ্য আহ্বানকারী একথা বলে সবাইকে আহ্বান করে যে, হে কল্যাণকামী! তুমি ইবাদতের পথে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! তুমি থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা অনেককে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর এ মুক্তিদান প্রত্যেক রাতেই সংঘটিত হয় *(তিরমিযী হা/৬৮২; মিশকাত হা/১৯৬০, সনদ ছহীহ)*।

সুধী পাঠক! আল্লাহ তা'আলার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথাযথ ছিয়াম সাধনা করতে হবে এবং রামাযানে নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। যাবতীয় পাপ ও অন্যায় থেকে তওবা করে আত্মশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিছন্ন করতে হবে। নীরবে নিভৃতে অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার ব্যাপ্তি আসমান ও যমীন সমপরিমাণ। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?' *(আলে ইমরান ১৩৩-১৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. 'প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী । আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে ক্ষমা চায়' *(তিরমিযী হা/২৪৯৯)*।

তাই আসুন! কুরআন নাযিলের এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জসহ সার্বিক ইবাদত সুসম্পন্ন করার অভ্যাস গড়ে তুলি এবং নিজ জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাওফীক দাও, যেন আমরা পবিত্র মাহে রামাযানকে সত্যিকার অর্থে সম্মান দিতে পারি, বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিহার করে শারঈ বিধান মোতাবেক সুন্দরভাবে ছিয়াম সম্পন্ন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও প্রভাষক, আলহেরা মহিলা ডিগ্রী কলেজ, যশোর]

অভিবাসী সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

-মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্বে অভিবাসী সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হচ্ছে। দিনের পর দিন তা প্রকট আকার ধারণ করছে। দীর্ঘদিন থেকে এ সমস্যার সুনির্দিষ্ট কোন সমাধান না থাকায় বর্তমানে এ সংকট আরো চরমে উঠেছে। নিম্নে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হ'ল :

অভিবাসীর পরিচয় :

অভিবাসী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'অভি' অর্থ ইচ্ছা আর 'বাসী' অর্থ পচা বা নষ্ট। ইংরেজি Immigrant শব্দের অর্থ অভিবাসী। Immigrant শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Immigrans বা im'grans থেকে এসেছে। বিশ্বে প্রথম আমেরিকানরা ১৭৮০-১৭৯০ সালে অভিবাসী শুরু করে। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A foreigner who comes into a country to live there permanently. অর্থাৎ 'অন্যদেশ থেকে বসবাসের জন্য যারা আসে বা যাদের আনা হয়, তাদেরকে অভিবাসী বলে'। Wikipedia-তে বলা হয়েছে, Immigration is the movement of people into a country to which they are not native in order to settle there especially as permanent residents or future citizens. অর্থাৎ 'মূলতঃ যেসব লোক নিজ দেশের (জন্মভূমির) বাইরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে অথবা ভবিষ্যৎ নাগরিকত্ব লাভের আশায় অন্যদেশে অবস্থান করবে, তাদেরকে অভিবাসী বলা হয়'। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ২৩ কোটি ১৫ লাখ ২২ হাযার ২ শত ১৫ জন অভিবাসী বিদ্যমান, যা বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ৩.২৫ ভাগ। অথচ ২০০৫ সালে ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে অভিবাসী ছিল ১৯১ মিলিয়ন বা ৩.০ ভাগ। অর্থাৎ বিশ্বে ক্রমাগত অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উইকিপিডিয়া ২০১২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী অভিবাসীদের প্রথম (২৩%) পসন্দনীয় দেশ হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে আছে কানাডা, ফ্রান্স, সঊদী আরব, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী এবং স্পেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের অন্যতম অভিবাসী পুনর্বাসনকারী দেশ। এক হিসাবে জানা যায়, বছরে দেশটি গড়ে ১৩,৭৫০ জন অভিবাসীকে পুনর্বাসিত করে থাকে। অভিবাসী হওয়ার মূল কারণগুলো হ'ল, পুশব্যাক, দারিদ্রতা, যুদ্ধ, অপরাধ প্রবণতা, মানবপাচার, বিচার থেকে রক্ষা পাওয়া, উচ্চ বেতনের আশা, ভাল চাকুরীর সুযোগ, চিকিৎসা, রাজনৈতিক আশ্রয়, বৈবাহিক সম্পর্ক, ধর্মীয়, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজে লাগানো প্রভৃতি।

রোহিঙ্গা ও অভিবাসী :

অভিবাসীদের কথা আলোচনা হ'লেই প্রথমেই নাম আসে রোহিঙ্গাদের। সে কারণে তাদের সম্পর্কে কিছু কথা আলোকপাত করা প্রয়োজন। রোহিঙ্গারা মুসলিম। তাদের নিজস্ব ভাষা রোহিঙ্গা, যা ইন্দো-ইউরোপিয়ান-বাংলা মিশ্রিত। রোহিঙ্গাদের আদিস্থল বিতর্কিত। কেউ বলেন রাখাইন আবার কেউ বলেন বাংলাদেশী। আরাকান রাজ্যের বর্তমান নাম রাখাইন প্রদেশে এদের বাসস্থান। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে না। বাংলাদেশ স্বীকার করে না বাঙালি হিসাবে। জাতিসংঘের মতে, বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত সম্প্রদায়ের একটি হ'ল সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা। ১৭৮৫ সালের দিকে বার্মিজরা আরাকান রাজ্য জয় করে রোহিঙ্গাদের হত্যা করতে শুরু করলে অনেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৮২৪-১৮২৬ সালে প্রথম ব্রিটিশ-বার্মা যুদ্ধে ব্রিটিশরা আরাকান দখল করে। তখন মুসলিম ও বৌদ্ধদের মধ্যে মারামারি বাঁধে। অতঃপর জাপানীরা রোহিঙ্গাদের ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং সাহায্যকারী মনে করে অন্তত দশ হাযার রোহিঙ্গা হত্যা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে রোহিঙ্গারা আরাকানে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৮ সালে আরাকান (বর্তমানে রাখাইন) বার্মার সাথে যুক্ত হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তা জেনারেল নি উইন ক্ষমতায় এলে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রবিহীন বাঙালি বলতে থাকেন। বার্মার ১৩৫টি ইথনিক জাতিগোষ্ঠী থেকে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর থেকে রোহিঙ্গারা ক্রমাগত বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করে। মূলতঃ বার্মিজরা মুসলিমদেরকে মিয়ানমারে রাখতে ইচ্ছুক নয়। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তিইন সিন ১৯৮২ সালে নতুন নাগরিকত্ব আইন করে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে এবং প্রস্তাব করেন রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোন দেশে পুনর্বাসিত করা বা দেশ থেকে প্রত্যাখ্যান করা। ২০১২ সালে মুসলিম-বৌদ্ধ দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে ২০১৪ সালে আদমশুমারী গণনাতে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের বাদ দেয়। কেননা তারা মনে করে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশী। ইতিমধ্যে অন্তত চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর প্রায় দেড়লাখ রোহিঙ্গা রাখাইনে থেকে যায় বস্তিবাসী হিসাবে। প্রায় এক লাখ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভাসমান জীবন-যাপন করছে। মিয়ানমার পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের সব নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। মূলতঃ এই চক্রান্তে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের বাধ্য করে সাগরে পাড়ি দিয়ে তৃতীয় কোন একটি দেশে আশ্রয় নিতে। তখন জাতিসংঘের রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ভূমিকাও ছিল মন্থর। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু এজেন্সির হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে আট হাযার রোহিঙ্গা সাগরে ভাসছে। সোজা কথায়, বার্মিজরা মনে করে রোহিঙ্গারা 'বাঙালি ভাইরাস'। ১৪,২০০ বর্গমাইল বেষ্টিত আরাকান রাজ্য ছিল মূলতঃ মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধের আবাসস্থল। ২০১৪ সালের আদমশুমারীতে দেখানো হয়েছে সেখানে মাত্র সাড়ে তিন লাখ লোকের আবাস। তন্মধ্যে দেড়লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম।

ইদানিং রোহিঙ্গাদের নিয়ে ব্যাংকক আলোচনায় বসেছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার বলছে, যদি রোহিঙ্গারা প্রমাণ করতে পারে যে, তারা রাখাইন বাসিন্দা তাহ'লে মিয়ানমার তাদের ফেরত নেবে। হাস্যকর যুক্তি, ২০১৪ সালের আদমশুমারীতে যে নাগরিকের নামই নেই সে কেমন করে প্রমাণ করবে যে, সে আরাকানের বাসিন্দা। মিয়ানমার চালাকি করে দশ লাখ লোকের মধ্যে চার লাখ লোক বাংলাদেশে, সাড়ে চারলাখ বিভিন্ন দেশে, প্রায় দশ হাযার নৌকায় প্রেরণ করে। আর বাকি এক লাখ চল্লিশ হাযার অভিবাসী হিসাবে অবস্থান করছে।

এদিকে থাইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন জানান, রোহিঙ্গাদের সাগর পাড়ির প্রবণতার নেপথ্যে জাতীয় পরিচয় না থাকাটাও একটা কারণ। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার কারণে এসব রোহিঙ্গা দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। দিনের পর দিন নিপীড়ন তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছ। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলিয়া বিশপ বলেন, এসব অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যে ৩০-

৪০ শতাংশ মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত মুসলিম রোহিঙ্গা *(দৈনিক আমাদের সময়, ২৪/০৫/২০১৫, পৃঃ ১১)*।

এদিকে বোস্টন গ্লোবের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিয়ানমার সরকারের অব্যাহত নির্যাতন ও বাতিল করা সাদা কার্ড হস্তান্তরের আতঙ্কে আছে দেশটির রাখাইন রাজ্যের মুসলিম অধিবাসী রোহিঙ্গারা। এই দুই কারণে তারা মৃত্যুঝুঁকি উপেক্ষা করে অন্য কোন দেশে আশ্রয়ের খোঁজে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। মিয়ানমার সরকারের নাগরিকত্ব আইনের অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক ১৯৮২ সালের আগে বার্মায় রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ছিল এবং বহাল থাকবে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি রাখাইন রাজ্যের জাতীয় নিবন্ধন সনদ বাতিল করে সাদা কার্ড বা অস্থায়ী পরিচয়পত্র ইস্যু করা হয়েছিল। হাফিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিয়ানমার সংসদ কর্তৃক নতুন একটি আইন অনুযায়ী সাদা কার্ডধারীরা এ বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিতব্য সংবিধান সংশোধন বিষয়ক জনমত ভোটে অংশ নিতে পারবে না। দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের ক্রমাগত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে এক নোটিশ জারী করে। গত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সাদা কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণের ঘোষণা দিয়ে নোটিশ জারী করে বলা হয়, '৩১ মার্চ ২০১৫-এর মধ্যে সাদা কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করতে হবে। ইহাতে রোহিঙ্গাদের জাতিগত পরিচয়ের আর কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট নেই'।

মিয়ানমার সরকারের অব্যাহত নির্যাতন ও বাতিল করা সাদা কার্ড হস্তান্তরের আতঙ্কে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রতিদিন শতশত রোহিঙ্গা সাগর পথে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে এক কাপড়ে রোহিঙ্গা নারী-শিশু মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে দেশ ছাড়ছে। যেসব রোহিঙ্গা সাগরে ভাসছে তারা খাদ্য ও পানির অভাবে চরম দুর্দশায় দিন পার করছে। অন্যদিকে কখনো কখনো দালাল চক্রের অত্যাচারে সাগর পথেই তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে।

মানবপাচার ও অভিবাসী সংকট :

সুধী পাঠক! অভিবাসীদের বর্তমান দুর্দশা চরম মানবিক বিপর্যয় বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। গত ১ মে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে গণকবর থেকে ২৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে আরও গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের পরিচয় নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা না গেলেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অভিবাসীরাই সেখানে গণহত্যার শিকার হয়েছেন। বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক আকারে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এসব ঘটনা ঘটিয়েছে মূলতঃ মানবপাচারকারীরা। কিন্তু এরপরই শুরু হয়েছে অভিবাসী সংকট। কয়েকটি দেশ বিশেষ করে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সামুদ্রিক বর্ডার এলাকায় তাদের দেশীয় কোস্টগার্ড সদস্যরা কড়াকড়ি আরম্ভ করে দেয়। বেরিয়ে আসে মানবপাচারসহ অভিবাসীদের হাযারও সমস্যার কথা ও কারণসমূহ। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হওয়ার প্রত্যাশায় সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে প্রায় দশ হাযার বাংলাদেশী আটকা পড়েছেন। এদের অনেকেই জেলে বন্দীত্ব জীবন কাটাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ আছেন আশ্রয়কেন্দ্রে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২ সপ্তাহে যারা পাচারকারীদের নৌকায় করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ভিড়তে পেরেছেন তাদের মধ্যে অন্তত ১ হাযার ৩০০ বাংলাদেশী আছেন। আর থাইল্যান্ডের আছেন সমপরিমাণ বাংলাদেশী। ৮ মে থেকে গত ১২ দিনে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া উপকূল থেকে প্রায় তিন হাযার বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম অভিবাসী উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই বারোশ' আছেন। এছাড়া বঙ্গোপসাগর ও আন্দামানে কয়েক ডজন নৌযানে এখনও প্রায় ৬ হাযার অভিবাসী আছেন। আবার নৌযানে খাবার নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, পাচারকারীদের নির্যাতন ও সাগরে ডুবে বহু অভিবাসী মৃত্যুবরণ করেছেন। যাদের পরিচয় সঙ্গত কারণেই জানা যায়নি। এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচআরের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়ান এডওয়ার্ডন বিশ্ব মিডিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, সাগরপথে চলতি বছর ৩ মাসে প্রায় ২৫ হাযার বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা পাচার হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রথম ৩ মাসে অনাহারে, পানিশূন্যতা ও পাচারকারীদের নির্মম নির্যাতনে আনুমানিক ৩'শ মানুষ সাগরেই প্রাণ হারিয়েছে। এদের অধিকাংশেরই সলিল সমাধি হয়েছে।

আটক বাংলাদেশীদের সংখ্যা থাইল্যান্ডে অনেক বেশী। গত ২-৩ বছর ধরে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে থাইল্যান্ডে তাদের অনেকেই আটক রয়েছেন বিভিন্ন কারাগারে ও বন্দী শিবিরে। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার সাগরে এখনও প্রায় ৬ হাযার অভিবাসী খাবার ও পানির সংকটে ভুগছেন *(দৈনিক যুগান্তর-২০/০৫/২০১৫)*।

দাস ব্যবসার এক লোমহর্ষক কাহিনী :

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মানবপাচারের জমজমাট ব্যবসার খবর যখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, ঠিক তখন থাইল্যান্ডের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আধুনিক 'দাস ব্যবসার' সঙ্গে প্রায় পুরো থাই সমাজ জড়িয়ে থাকার লোমহর্ষক এক রক্তক্ষরণ তথ্য তুলে এনেছেন বিবিসির সাংবাদিক ও প্রতিবেদক জোনাথন হেড। গত মাসের শেষ দিকে আন্দামান সাগরে থাইল্যান্ডের একটি দ্বীপে পাচারের শিকার মানুষের গণকবর সন্ধান পাওয়ার খবর যখন বাতাসে ভাসছে তখন একদল থাই স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে তিনি ওই এলাকায় যান। যে জায়গায় গণকবর পাওয়া গেছে, সেই স্থানটি মানবপাচারকারীরা ব্যবহার করছিল অবৈধ অভিবাসীদের সাময়িকভাবে রাখার ক্যাম্প হিসাবে। সময় সুযোগমত সেখান থেকে পাঠানো হ'ত দক্ষিণ মালয়েশিয়ার সীমান্তের দিকে। ওইসব অভিবাসীদের মারধর করা হ'ত এবং অভুক্ত রাখা হ'ত। ট্রাক বোঝাই করে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ত। এমনকি এসব কাজ সুচারুরূপে করার জন্য পাহারা পর্যন্ত বসানো হ'ত। এমনকি এখানে তাঁবুতে এনে রাখত অতঃপর অর্থের জন্য তাদের পিতা-মাতার বা আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফোন করাতে বাধ্য করত। টাকা দিতে না পারলে বা টাকা না দিলে পেটানো হ'ত এবং অভুক্ত রাখা হ'ত। আর নারীদের দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হ'ত। পাচারের শিকার এসব মানুষের মৃত্যু হ'লে ট্রাকে করে তাদের লাশ সরিয়ে গণকবর দেওয়া হ'ত অথবা সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেওয়া হ'ত। অতঃপর তাদের পরিবারের নিকট ফেরত দেওয়ার কথা বলে টাকা আদায় করা হ'ত। তিনি বলেন, ৩০০ মানুষের একটি নৌকার জন্য তারা ২০ হাযার ডলার বা তার বেশী অর্থ আদায় করে। পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপন আদায়ের জন্য অভিবাসীদের জঙ্গলে আটকিয়ে রেখে মালয়েশিয়ার স্বল্প মজুরীর কাজের জন্য এসব মানুষের কাছ থেকে তারা জনপ্রতি দুই থেকে তিন হাযার ডলার আদায় করে থাকে। এসব কাজে মানবপাচারকারীদের সে দেশের প্রশাসনসহ সর্বশ্রেণীর লোক অর্থের বিনিময়ে সহায়তা করে বলে তিনি ডকুমেন্ট ও প্রমাণসহ জানিয়েছেন *(দৈনিক আমাদের সময়, শনিবার, ২৩/০৫/২০১৫, পৃঃ ১-১১)*।

এদিকে নতুন রিপোর্টে জানা যায়, মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ও অভিবাসীদের গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ার পারলিস রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী শহর পাদাং বেসারের গভীর জঙ্গলে অন্তত ৩০টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব গণকবরে প্রায় কয়েক'শ অভিবাসীর মরদেহ রয়েছে। গণকবরের এসব মরদেহ বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম অভিবাসী বলে দাবী করেছে মালয়েশিয়ার একটি গণমাধ্যম। গণমাধ্যমটি জানায়, আবিষ্কৃত গণকবরের স্থানটি একটি পাহাড়ী ও সংরক্ষিত এলাকা। এসব এলাকায় সাধারণ জনগণের প্রবেশ নিষেধ। রবিবার মালয় মেইল অনলাইনের বরাত দিয়ে 'দ্য স্টার' পত্রিকা এ খবর জানায়। এ ঘটনার পরের দিন মালয়েশিয়ার পুলিশের মহাপরিদর্শক আবুবকরের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমগুলো জানায়, থাইল্যান্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর মালয়েশিয়া। কারণ দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে ১১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ১৩৯টি গণকবর ও ২৮টি বন্দিশিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে *(দৈনিক যুগান্তর, প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং আমাদের সময় ২৬ - ২৭ মে ২০১৫, পৃঃ ১-১১)*।

মালয়েশিয়া সরকার আরো বলেছে, তারা মানবপাচারকারীদের ঘাঁটি ও গণকবর পাওয়ার খবরে খুবই মর্মাহত। কিন্তু মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, এ বিষয়ে তারা আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। স্থানীয় গ্রামবাসীর মতে, তারা অভিবাসীদের প্রকাশ্যেই দেখেছে। পেরলিস রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামবাসীর একজন প্রবীণ অধিবাসী জনাব সানি হাশিম বলেন, 'অনাহারে ভোগা ও নির্যাতনের শিকার হওয়া অনেক অবৈধ অভিবাসীকে তাঁরা প্রকাশ্যেই দেখতে পেয়েছেন। তারা খাদ্য ও পোশাক ভিক্ষা করতে আমাদের নিকট আসত। তিনি বলেন, তখন আমরা যা পারতাম, তা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতাম। তাদের অনেকে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারত না। তখন আমরা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা তাদের তুলে নিত'। এ বিষয়ে মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটসের নির্বাহী পরিচালক অ্যামি স্মিথ বলেন, মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ ছিল অন্ধ ও বধির। এই পাচারকারীচক্রটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইনি রেহাই পেত' *(দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২৮/৫/২০১৫, পৃঃ ১৩)*।

অভিবাসী সংকট উত্তরণে প্রস্তাবনা সমূহ :

অভিবাসীদের সংকট উত্তরণ ও স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলিসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের প্রস্তাবনা :

(১) মানুষের জীবন রক্ষার সর্বোচ্চ ও সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে।
(২) পুশব্যাক বন্ধ করতে হবে এবং যে দেশের বাসিন্দা ও যে দেশে অবস্থান করতে চায় তাদেরকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) উদ্ধারকৃত অভিবাসীদের সুন্দর আবাসন নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) বৈধভাবে বিদেশ গমন সহজলভ্য করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
(৫) মানবপাচার বন্ধ করতে হবে এবং পাচারকারীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
(৬) নিজ নিজ দেশে অভিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
(৭) এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়ে রাষ্ট্রকে আইন মানতে বাধ্য করতে হবে অন্যথায় আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনতে হবে।
(৮) অভিবাসীদের নিয়ে যেসব সংস্থা কাজ করে তাদের পরিধি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
(৯) আন্তর্জাতিক ফান্ড বা তহবিল গঠন করে তাদের সুযোগ-সুবিধা বা মৌলিক অধিকার নিশিচত করতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম কিংবা বাংলাদেশীদের উপর যে নিষ্ঠুরতা ও নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে যুলুম। অথচ যুলুম-নির্যাতন ইসলামে হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছ না, অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই অত্যাচারী জনপদ হ'তে মুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক প্রেরণ কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে সাহায্যকারী প্রেরণ কর' *(নিসা ৪/৭৫)*। إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং যমীনে বিদ্রোহ করে বেড়াই। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/৪২)*। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا- وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ানত কর, তবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে হ'লে অন্যকথা। তোমরা একে অন্যকে হত্যা কর না। আর যে কেউ সীমালংঘন কিংবা যুলুমের বশবর্তী হ'য়ে এরূপ করবে তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 'নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী যালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ' *(শু'আরা ২৬/২২৭)*। إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীকে পসন্দ করেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنُ مِنْ لِسَانِه وَ يَدِه 'প্রকৃত মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে' *(ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৯, সনদ ছহীহ)*।

পরিশেষে বলব, মহান আল্লাহ যালেমদের যুলুম ও নির্যাতন হ'তে অভিবাসীদের হেফাযত করুন এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দকে লোমহর্ষক এই অভিবাসী সংকট সমাধানে সুমতি দান করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

[লেখক : সম্পাদক, মাসিক হারাবতী, জয়পুরহাট]

পহেলা বৈশাখ : অপসংস্কৃতির ভয়াবহ রূপ

-আকরাম হোসাইন

ভূমিকা :

অপসংস্কৃতির কৃষ্ণ-কালো ধূম্রকুঞ্জ বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসকে গ্রাস করে চলেছে। ধর্মহীনতা, নৈতিকতাবিচ্ছিন্ন সংশয়বাদিতা, উন্নাসিকতার তীব্র প্লাবনে শিকড়বিহীন কচুরিপানার মত অস্থিরচিত্তে মানবজাতি ধাবিত হচ্ছে এক অনিশ্চিত ও অজানা গন্তব্যের পানে। বর্তমানে সংস্কৃতির একটি বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে নববর্ষ পালন, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া ও সাথে রয়েছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুবর্ণ সুযোগ। নববর্ষকে আহ্বান জানাতে গিয়ে মুসলিম নর-নারী আবেগে উত্তেজনায় হিল্লোলিত হয়ে বড় ধরনের পাপ ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। পহেলা বৈশাখে ভোর না হ'তেই নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মধ্যে দিয়ে রমনায় পান্তা খাওয়ার মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা চত্বরে যুবক-যুবতীরা তাদের বুকে-পিঠে উল্কি একে নেবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। নানা দিকে নানান মিছিল শুরু হয়ে যায়। আর মিছিল শুধু মিছিল নয়, ঢোল-বাদ্যসহকারে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরিহিত নারী-পুরুষের বেহায়পনা অঙ্গভঙ্গি নিয়ে সে এক অকথ্য দৃশ্য। এরা যখন বানর, হনুমান, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, ঘোড়ার মুখোশ পরে রাজপথে মঙ্গল শোভাযাত্রা (!) বের করে, তখন মনে হয় এরা নিজেদেরকে মানুষ পরিচয় দিতেই লজ্জাবোধ করে। এরা যেন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চেয়ে বিবেক-বিবেচনাহীন বানর, হনুমান, বাঘ ও ভাল্লুক হ'তে বেশী ভালবাসে। তাছাড়া বর্তমানে তো তথাকথিত শিক্ষিত (?) সমাজ তাদের চেয়েও নীচে নেমে গেছে। সারাটি দিন এক শ্রেণীর বেহায়া মানুষের অসভ্য-অশ্লীলতার দুর্গন্ধে ভরে থাকে। আর সন্ধ্যায় শুরু হয়ে যায় পূজারী-পূজারিণীদের 'এসো হে বৈশাখ' ইত্যাদি আরতি ধরনের বন্দনগীতি নিয়ে দেহমন সমর্পিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা আসলে প্রকৃতি পূজা ও রবীন্দ্রপূজারই নামান্তর। আর এসবই চলতে থাকে তথাকথিত 'প্রগতিবাদ', 'আধুনিকতাবাদ' নামে, 'নান্দনিকতাবাদ', ও 'আবহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতি'র নামে।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস :

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে চান্দ্রবর্ষ ভিত্তিক হিজরী সন প্রচলিত ছিল। যেহেতু চান্দ্রবর্ষের হিসাবে একই মওসুমে একই মাস বিদ্যমান থাকে না। তাই উপমহাদেশের রাজকোষের খারাজ বা খাযনা আদায়ের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হয়। সাধারণতঃ কৃষকরা প্রধান ফসল যখন তোলেন, তখন খাযনা আদায় সুবিধাজনক। কারণ ফসল উৎপন্ন হয় মওসুম বা ঋতুভিত্তিক, আর হিজরী মাস চান্দ্রভিত্তিক। এমতাবস্থায় কৃষকদের অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে বাদশাহ আকবর খাযনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরী সনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে একটি বাৎসরিক সন উদ্ভাবন করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমীর ফাতেহুল্লাহ সিরাজীকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে দায়িত্ব প্রদান করেন। আমীর ফাতেহুল্লাহ সিরাজী হিজরী সনের চলমান বর্ষকে বজায় রেখে চন্দ্র গণনাভুক্ত বর্ষ ৩৫৪ দিনের স্থলে ৩৬৫ দিনে এনে হিজরী সনকে সৌর গণনামুক্ত করে একটি নতুন সনের উদ্ভাবন করেন। অতঃপর ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আকবর এক ফরমান জারির মাধ্যমে এই সন অনুযায়ী খাযনা আদায়ের ঘোষণা দেন। ফসল বুননের মওসুম অর্থাৎ বৈশাখে শুরু হয় বছরের শুভারম্ভ। এ কারণে এটি ফসলী সন হিসাবেও এই ভূখণ্ডের মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গঠিত বাংলা একাডেমীর পঞ্জিকার তারিখ নির্ণয় কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তারই নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়। উক্ত বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সুপারিশমালার প্রথম ধারাতেই উল্লেখ করা হয়েছে, মোঘল আমলে বাদশাহ আকবরের সময় হিজরী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে বঙ্গাব্দ সালের প্রচলন করা হয়েছিল, তা থেকে বছর গণনা করতে হবে। এই সুপারিশমালায় বাংলা সনের মাসগুলো যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিবসের হিসাবে গণনা করা সম্ভব হয়, তা ভেবে বাংলা সনের পঞ্চম মাস ভাদ্র পর্যন্ত প্রত্যেক মাস ৩১ দিনে হবার কথা বলা হয় এবং একইভাবে বাংলা সনের ষষ্ঠ মাস আশ্বিন থেকে দ্বাদশ মাস চৈত্র পর্যন্ত প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে হবার কথা বলা হয়। সুপারিশমালায় লিপ-ইয়ার বা অধিবর্ষ সম্পর্কে বলা হয়, লিপ-ইয়ার বা অধিবর্ষের চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। এই সুপারিশমালায় আরো বলা হয় যে, ৪ দ্বারা যে সন বিভাজ্য হবে তা অধিবর্ষ বা লিপ-ইয়ার হিসাবে গণ্য হবে।

পহেলা বৈশাখের উৎপত্তি ও হালখাতা সংস্কৃতির সূচনা :

আকবরের সময়কাল থেকে পয়লা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাযনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এর পরদিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে ভূমির মালিকেরা নিজ নিজ অঞ্চলের মানুষকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতে শুরু করেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এক পর্যায়ে উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যার রূপ পরিবর্তিত হয়ে এখন 'পহেলা বৈশাখ' দিবস পালনের পর্যায়ে এসেছে। তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি 'হালখাতা' তৈরি করা। 'হালখাতা' বলতে একটি নতুন হিসাব বইকে বোঝানো হ'ত। আসলে হালখাতা হ'ল বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকান-পাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। গ্রাম, শহর বা বাণিজ্যিক এলাকা, সব স্থানেই পুরোনো বছরের হিসাবের বই বন্ধ করে নতুন হিসাবের বই খোলা হয়। হালখাতার দিনে দোকানিরা তাদের ক্রেতাদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন। এই প্রথাটি এখনো বেশ প্রচলিত *(প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০১৫ ইং)*।

উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, এটি শুধু জনগণের উপর আরোপিত কর ও শুল্ক পরিশোধের জন্য প্রবর্তিত একটি তারিখ মাত্র। সেই সাথে এর মাধ্যমে শাসকগণ কর্তৃক প্রজাদের উপর শোষণ-নিপীড়ন করে খানিকটা আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করে। যা পরিষ্কারভাবে আকবরী আমলের একটি জঘন্যতম কর্মকাণ্ড মাত্র।

পান্তা-ইলিশ কাহিনী : নগ্ন পদে বিচরণ

গ্রাম বাংলার মানুষের আদি সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরে চলছে পান্তা খেতে ইলিশ ক্রয়ের ধুম। ইলিশ না হ'লে যেন পহেলা বৈশাখ অন্ধকার হয়ে যাবে! ব্যবসায়ীরাও সুযোগ বুঝে ৫শ' টাকার ইলিশ ৫ হাযার টাকায় বিক্রি করছে; একইভাবে সাইজে বড় ইলিশের দাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাযার টাকায়। শহরের কিছু শিক্ষিত (?) জ্ঞানপাপী ও কথিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী এবং প্রগতিশীলরা প্রচার করছে পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। রমনার বটমূল থেকে শুরু করে রাজধানীর রাস্তা-ঘাটে, পার্কে, রেস্তোরাঁয় বিক্রি হবে মাটির সানকিতে পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ। শখ করে ধনী, মধ্যবিত্ত সবাই ভাজা ইলিশের গন্ধে পান্তার স্বাদ আস্বাদন করেন।

প্রশ্ন হ'ল, এগুলো কি বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার প্রাচীন বা আদি সংস্কৃতি? বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক শামসুযযামান খান 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' টিভির এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি নয়। আশির দশকের আগেও রাজধানীতে এসব দেখা যায়নি। প্রবাদে রয়েছে 'উর্বর মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা'।

মূলতঃ আশির দশকে হঠাৎ করেই পান্তা-ইলিশ ও 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র প্রচলন শুরু হয়। জানা যায়, ১৯৮৪ সালের ১৪ এপ্রিল, কর্মহীন কিছু ব্যক্তি পহেলা বৈশাখের দিন এক বেকারকে কিছু উপার্জনের জন্য রমনা পার্কে পান্তা ভাতের দোকান দেয়ার পরামর্শ দেয়। সে মতে ফুটপাতের জনৈক বেকার পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ ও বেগুন ভর্তা নিয়ে ঢাকার রমনা বটমূলে খোলা উদ্যানে দোকান দেয়। প্রচণ্ড গরমে পার্কে ঘুরতে আসা মানুষ সে দোকানে এসে সেই পান্তা-ইলিশ ভাজা এবং ভর্তা নিয়ে ফুটপাতের লোকজনের মত দূর্বাঘাসের উপর বসেই খায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পান্তা শেষ। অতঃপর দুপুরের রোদে পার্কে ঘুরতে আসা মানুষ পান্তা না পেয়ে পাশের স্টলে থাকা চটপটি, সিঙ্গারা, সামুচা, আইসক্রিম ইত্যাদি খেয়ে ঘুরাফেরা করেন। তখন থেকে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে রমনা পার্কে পান্তা ইলিশের আয়োজন করা হয়। এই হ'ল পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশের ইতিহাস *(দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ এপ্রিল ২০১৫ ইং)*।

পহেলা বৈশাখে যা রয়েছে :

হিন্দুয়ানী গুণে গুণান্বিত সম্রাট আকবর উদ্ভাবিত মিকশ্চার ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র মত সব ধর্মের অংশগ্রহণে একটি সার্বজনীন (!) উৎসব পালন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে 'পহেলা বৈশাখ' মূলতঃ হিন্দুদের তথা অমুসলিমদের উৎসব। কেননা এতে রয়েছে- ১. হিন্দুদের ঘটপূজা ২. গণেশ পূজা ৩. সিদ্ধেশ্বরী পূজা ৪. ঘোড়ামেলা ৫. চৈত্রসংক্রান্তি পূজা-অর্চনা ৬. চড়ক বা নীল পূজা ৭. গম্ভীরা পূজা ৮. কুমীরের পূজা ৯. অগ্নিপূজা ১০. ত্রিপুরাদের বৈশুখ ১১. মারমাদের সাংগ্রাই ও পানি উৎসব ১২. চাকমাদের বিজু উৎসব (ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের পূজা উৎসবগুলোর সম্মিলিত নাম বৈসাবি) ১৩. হিন্দু ও বৌদ্ধদের উল্কিপূজা ১৪. মজূসী তথা অগ্নি পূজকদের নওরোজ ১৫. হিন্দুদের বউমেলা ১৬. হিন্দুদের মঙ্গলযাত্রা ১৭. হিন্দুদের সূর্যপূজা।

সুধী পাঠক! পহেলা বৈশাখ মূলতঃ হিন্দু তথা অমুসলিমদের সংস্কৃতি। সেদিনকে লক্ষ্য করে তারা বিভিন্ন পূজা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, যা ইসলামী শরী'আত সমর্থন করে না। অতএব প্রকৃত কোন মুসলিমের জন্য তাদের এ সমস্ত নোংরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে না। এ থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে বাংলা নববর্ষ পালন :

ইসলামী শরী'আতে যেকোন ধরনের নববর্ষ পালন করা হারাম ও বিদ'আত। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী 'পহেলা বৈশাখ' পালনের সংস্কৃতি এসেছে হিন্দুদের সংস্কৃতি থেকে। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ পালনের ইতিহাস ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটা মুসলিমদের সংস্কৃতিও নয়। আর অনৈসলামিক সংস্কৃতি পালন করে মানুষ নিজেকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। কেননা রাসূল (ছঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদের অর্ন্তভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ ছহীহ)*।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। অতএব এখানে কোন কিছুই যোগ বিয়োগের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ 'প্রতিটি জাতির জন্য আমি অনুষ্ঠান (সময় ও স্থান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তাদেরকে পালন করতে হয়' *(হজ্জ ২২/৬৭)*। মূলতঃ দুই ঈদ ব্যতীত মুসলিমদের অন্য কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলিমদের দু'টি আনন্দের দিন ১. ঈদুল ফিতর ও ২. ঈদুল আযহা *(ছহীহ বুখারী হা/৫৫৭১)*।

আনাস (রাঃ বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন মদীনাবাসী (যাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাহাবী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) দু'টি জাতীয় উৎসব করছে। তারা খেল-তামাশা ও আনন্দ উৎসব করছে। তাদের এ আনন্দ অনুষ্ঠান দেখে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যে এই দু'টি দিন জাতীয় উৎসব কর, এর মৌলিকত্ব ও তাৎপর্য কী?' তারা জওয়াব দিল, 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের জীবনে আমরা এই উৎসব এমনি হাসি-তামাশা ও আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে পালন করতাম, এখন পর্যন্ত তাই চলে আসছে'। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই উৎসব দিনের বদলে তা হ'তে অধিকতর উত্তম দু'টি দিন 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' দান করেছেন। অতএব পূর্বের উৎসব ছেড়ে দিয়ে এই দু'টি দিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করতে শুরু কর *(মুসনাদে আহমাদ, আবুদাঊদ......)*। উল্লেখ্য জাহেলিয়াতের যুগে মদীনাবাসী যে দু'দিন জাতীয় উৎসব পালন করত, তার এক দিনের নাম ছিল নওরোজ (নববর্ষ)। আর অপরটির নাম ছিল মেহেরজান। সুতরাং সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের নামেই হোক এই দুই উৎসব ছাড়া বাকি সব ধরণের উৎসবই পরিত্যাজ্য।

বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্রকে পথভোলা মুসলিমগণ জেনেশুনে বা অজান্তেই বহু পাপে নিমজ্জিত। অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলের বিষক্রিয়ায় তারা আজ জর্জরিত। ফলে ইসলামের সার্বজনীন ও চিরস্থায়ী সংস্কৃতি হয়েছে ভূলুণ্ঠিত।

Contents

১. বৈশাখী সূর্যকে স্বাগত জানানো :

চারুশিল্পীদের রমনার বটমূলে ছায়ানটের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান 'এসো এসো হে বৈশাখ এসো এসো........!' গানের মাধ্যমে প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানায়। এছাড়াও নতুন সূর্যকে প্রত্যক্ষকরণ ও নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে পান্তা-ইলিশ ভোজ, বৈশাখী মেলা, যাত্রা, শিল্পীদের সংগীত পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান প্রভৃতি বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

পর্যালোচনা :

এ ধরণের কর্মকাণ্ড মূলতঃ সূর্য ও প্রকৃতি পূজারী বিভিন্ন প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনুকরণ মাত্র, যা আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে পুনরায় শোভনীয় হয়ে উঠেছে। ইসলামে সূর্যকে স্বাগত জানানো, সূর্যের আহ্বান বিষয়টি প্রকারান্তরে সূর্যপূজারই শামিল এবং ইসলামে এটি সম্পূর্ণ হারাম। কেবল সূর্য কেন কোন সৃষ্টিকেই কোন প্রকার ক্ষমতার উৎস জ্ঞান করাই ইসলাম পরিপন্থী। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেরই ধর্মের নাম শোনামাত্র গাত্রদাহ সৃষ্টি হলেও প্রকৃতি পূজারী আদিম ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নকল করতে তাদের অন্তরে অসাধারণ পুলক অনুভূত হয়। সূর্য ও প্রকৃতি পূজা বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জাতির লোকেরা করে এসেছে। মানুষের ভক্তি ও ভালবাসাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির প্রতি আবদ্ধ করে তাদেরকে শিরকে লিপ্ত করানো শয়তানের সুপ্রাচীন 'ক্লাসিকাল ট্রিক' বলা চলে। শয়তানের এই কূটচালের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.

'আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখেছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভনীয় করেছে...' *(নামল ২৭/২৪)*।

আজকের বাংলা নববর্ষ উদযাপনে গান গেয়ে বৈশাখী সূর্যকে স্বাগত জানানো, আর কুরআনে বর্ণিত প্রাচীন জাতির সূর্যকে সিজদা করা এবং উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের সৌর নৃত্য এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; বরং এ সবই স্রষ্টার দিক থেকে মানুষকে অমনোযোগী করে সৃষ্টির আরাধনার প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তোলার এক শয়তানী ফাঁদ মাত্র। এমনকি বৈশাখের আগমনী গান হিসাবে রবি ঠাকুরের যে গান গাওয়া হচ্ছে, তাতেও রয়েছে শিরকের দুর্গন্ধ। 'এসো হে বৈশাখ......! নাউযুবিল্লাহ। বৈশাখের কি নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে? অথচ বৈশাখকে আহ্বান করা হচ্ছে! কবির ভাষায়, 'মুমূর্ষ রে দাও উড়ায়ে, আবর্জনা, জরাজীর্ণ দূর কর'। অথচ এসবের কোন একটিও দূর করার ক্ষমতা বৈশাখের নেই। মুমূর্ষকে সুস্থতা দানকারী একমাত্র আল্লাহ, সময়ের পরিবর্তণকারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহই যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। বৈশাখ মাসে যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তা তো আল্লাহ্‌রই দান। দুঃখের বিষয় শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে মুসলিম ঘরের সন্তানরা আজ আল্লাহ্‌র সাথে শিরকের মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত। অথচ শিরককারীর উপর জান্নাতকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন *(মায়েদা ৫/৭২)*।

২. মেলা :

মেলায় নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। এই মেলা নারীদেরকে বেপর্দায় চলতে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রসার ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

'যারা পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না' *(নূর ২৪/১৯)*।

৩. হালখাতা :

এই হালখাতার মধ্যেও রয়েছে শিরকের দুর্গন্ধ। সমাজে একটি ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচলন আছে, যে বছরের প্রথম দিনে বাকির খাতায় নাম উঠাবে, তাকে সারা বছরই বাকি নিয়ে চলতে হবে। অথচ এটি সম্পূর্ণ শিরকী আক্বীদা।

৪. মঙ্গল শোভাযাত্রা :

'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নামে আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও অজ্ঞ মানুষের ন্যায় বর্তমান যুগে তথাকথিত শিক্ষিত মহল বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের মুখোশ পরে, অশ্লীল নৃত্য ও ঢাক ঢোল পিটিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে থাকে এবং একে লক্ষ্য করে মঙ্গল লাভের আশা করে। অথচ এটা স্পষ্ট শিরক।

পর্যালোচনা :

পশু-পাখির ছবি ও মুখোশ প্রদর্শন মূর্তিপূজারই বর্হিঃপ্রকাশ বা মূর্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত করারই অপচেষ্টা মাত্র। যুগে যুগে আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন মূর্তি ভেঙ্গে আল্লাহ্‌র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠার জন্য। অথচ অজ্ঞ মুসলিমরা আজ সেই মূর্তি নির্মাণ করে মঙ্গল লাভের আশায় 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র আয়োজন করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কি হতে পারে? মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 'শুনে রাখ! তাদের অশুভ আলামতের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই হাতে রয়েছে। অথচ এরা জানে না' *(আ'রাফ ৭/১৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলতঃ শিরক করল' *(মুসনাদে আহমাদ ২/২২০)*।

৫. উল্কি আঁকা :

উল্কি আঁকা অর্থ শরীরে আঁকা-আঁকি করা। পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে অনেক যুবক-যুবতীরা তদের গালে বা শরীরের বিভিন্ন অংশে উল্কি অঙ্কন করে।

পর্যালোচনা :

এটি একটি কাবীরা গুনাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 'যে নারী দেহে কিছু অঙ্কন করে এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেই উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ' *(বুখারী হা/৫৯৩৩; মুসলিম হা/৫৬৮৭)*। তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে, শরীরে কিছু অঙ্কন করলে তার উপর

আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষণ হয়। অর্থাৎ সে অভিশপ্ত। আর অভিশপ্তরা কখন সফলকাম হয় না। তাছাড়া এতে আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয়, যা কুরআনের নির্দেশনা মতে হারাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতেও উল্কি অঙ্কন ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

৬. বিভিন্ন জীবজন্তু ও প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি :

পহেলা বৈশাখকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জীবজন্তু ও প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়। এগুলোকে বৈশাখী প্রেমিকরা নিজেদের মুখোশ তৈরী করে বানর, হনুমান, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি বেশে সাজে এবং এগুলো নিয়েই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

পর্যালোচনা :

ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকল প্রকার মিথ্যা দেবতার অবসান ঘটিয়ে একমাত্র ও প্রকৃত ইলাহ এবং সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্র ইবাদতকে প্রতিষ্ঠিত করা, যেন মানুষের সকল ভক্তি, ভালবাসা, ভয় ও আবেগের কেন্দ্রস্থলে থাকেন। অপরদিকে শয়তানের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বিবিধ প্রতিকৃতির দ্বারা মানুষকে মূল পালনকর্তার ইবাদত থেকে বিচ্যুত করা। আর তাই তো ইসলামে প্রতিকৃতি কিংবা জীবন্ত বস্তুর ছবি তৈরি করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে (জীবন্ত বস্তুর) ছবি তৈরিকারীরা *(মুসলিম হা/৫৬৫৯)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا 'যে কেউ ছবি তৈরি করল, আল্লাহ তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) ততক্ষণ শাস্তি দিতে থাকবেন, যতক্ষণ না সে এতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে কখনই তা করতে সমর্থ হবে না' *(বুখারী হা/২২২৫; মুসলিম হা/২১১০)*।

৭. বাদ্য-বাজনা ব্যবহার :

গান-বাজনা ও ঢোল-তবলা ছাড়া পহেলা বৈশাখ যেন অপূর্ণাঙ্গ। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে এগুলো যেন পূর্বশর্ত।

পর্যালোচনা :

বাদ্য-বাজনার ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফূর্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(লুক্বমান ৩১/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে, যারা যেনা, (পুরুষের জন্য) সিল্ক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে' *(বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)*। তাছাড়া পূজার অন্যতম উপাদান হ'ল গান ও ঢোল-তবলা বাজানো।

৮. নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা চর্চা :

শালীন মেয়েরাও পহেলা বৈশাখের নামে অর্ধ নগ্ন হয়ে বের হয়। গরমের দিনে তথাকথিত পহেলা বৈশাখের সাদা শাড়ি ঘামে ভিজে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত নোংরাভাবে প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও নারী-পুরুষ ঢলাঢলির মাধ্যমে ব্যভিচারের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৈরি হয় পহেলা বৈশাখের সংস্কৃতিতে। পান্তা-ইলিশের সাথে ইদানিং যোগ হয়েছে, যুবতী মেয়েদের হাতে খেয়ে মনের নোংরা চাহিদা মেটানো। উল্কি অঙ্কনের ক্ষেত্রেও বিপরীত লিঙ্গের হাত ব্যবহার করা হয়। যা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা। বৈশাখী মেলা ও বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলোতে তরুণ-তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে নীরবে-নিবৃতে প্রেমিক-প্রেমিকার খোশ গল্প, অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়পনা ও নগ্নতায় জড়িয়ে পড়ে। এ হ'ল বৈশাখের বাস্তব চিত্র।

পর্যালোচনা :

নারী-পুরুষের এই ধরণের মেলামেশা ও কার্যকলাপ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩২)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন'। 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রাকাশ করার জন্য জোর পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(নূর ৪১/৩১-৩২)*।

আল্লাহ পর্দা সম্পর্কে বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান কর, আর পূর্বের অজ্ঞতার যুগের নারীদের মত বেশ বিন্যাস করে বাইরে যেও না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

সুধী পাঠক! আল্লাহ্র এই হুকুম না মানার দরুণ নারীরা আজ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানী, লাঞ্চিত, অপমানিত, সম্ভ্রমহানীর শিকার হচ্ছেন। এবার পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সময় ঢাবির টিএসসি চত্ত্বর সহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে নারীর বস্ত্রহরণ হওয়ার ঘটনাও ঘটে, যা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

৯. নতুন পোশাকে সাজসজ্জা ও আকর্ষণীয় খাবার ব্যবস্থা :

পহেলা বৈশাখকে ঈদের মত মর্যাদা দিয়ে জাতীয়ভাবে নতুন পোশাক ও আকর্ষণীয় খাবার গ্রহণের কালচার সৃষ্টি করা হয়। এমনকি এটাও বল হয় যে, এটা না-কি বাঙালীদের সবচেয়ে বড়

জাতীয় উৎসব! তাহ'লে ঈদ কত নম্বর সিরিয়ালে? অথচ মুসলিমের জাতীয় জীবনে দু'টি উৎসব দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের বারো মাসে ১৩ পূজার আদলে কোন মুসলিমের জন্য 'পহেলা বৈশাখ'কে আরেকটি বাৎসরিক উৎসবের দিন ধার্য করা জায়েয নেই। সাথে এই দিনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে হরেকরকম খাবারের আয়োজন করা এবং নতুন পোশাকে সাজসজ্জা করাও ঠিক নয়। ইদানিং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের অতি তোড়জোড় দেখে মনে হয় তারা এটাকে দেশের মানুষের প্রধান উৎসব হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করছে।

১০. নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় :

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন তথা পহেলা বৈশাখ সহ অনৈসলামিক বিভিন্ন উৎসবে মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে। কিন্তু এ ধরণের শুভেচ্ছা বিনিময় করা কী ইসলামী শরী'আতে গ্রহণীয়?

পর্যালোচনা :

এ বিষয়ে শায়েখ ইবনু উছাইমীন (রহঃ)-এর ফৎওয়া নিম্নরূপ :

'একজন মুসলিম বা অমুসলিমকে সম্ভাষণ অথবা অভিনন্দন জানানো তাদের বড়দিনে, নববর্ষে অথবা অন্য কোন বিশেষ উৎসবের দিনে এবং তাদের অভিনন্দনের উত্তর দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেননা বিজাতীয়দের উৎসবের অভিনন্দনের উত্তর দেওয়া হচ্ছে তাদের উৎসবকে সম্মতি এবং অনুমোদন দেওয়া। আরব আলেমদের ঐকমত্যে, বড় দিনে বা অন্যান্য বিজাতীয় উৎসব উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানানো হারাম'।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'বিধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো হারাম। এর কারণ হচ্ছে, যে এরূপ করে সে কাফের। মুশরিকদের রীতিনীতির অনুমোদন বা সমর্থন করে, যদিও সে সেই সব রীতিনীতি নিজের জন্য বৈধ মনে করে না। তাই বিজাতীয় ও বিধর্মীদের উৎসবে অভিনন্দন জানানো নিষিদ্ধ, যদিও সে সহকর্মী হয় বা অন্য কেউ হয়। তারা যদি তাদের উৎসবে আমাদের অভিনন্দন জানায়, তবে আমাদের নীরব থাকতে হবে। কারণ ওগুলো আমাদের উৎসব নয়। একইভাবে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ এমনদিনে তাদের অনুকরণ করা, তাদের উৎসবের দিন উৎসব করা অথবা উপহার আদান-প্রদান করা কিংবা খাদ্য বা মিষ্টি আদান-প্রদান করা অথবা ছুটি নেওয়া ইত্যাদি (....)। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখল, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৩৫১৪)*।

১১. পান্তা-ইলিশ ভোজের নামে অপচয় ও ক্ষতি :

পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। যদিও ইতিপূর্বে পান্তা-ইলিশের রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোনকালেই বাঙ্গালী সংস্কৃতি ছিল না। অথচ রমনার বটমূল থেকে শুরু করে বাংলার আনাচে-কানাচে পান্তা-ইলিশের হিড়িক পড়ে যায়। ফলে অপচয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় মাটির সাকনিতে পান্তা বিক্রয় করা হয় ১০০-৫০০ টাকায় এবং ইলিশ ৫০০-১২০০০ টাকায়। আর হুজুগে বাঙ্গালীরা তা উৎফুল্লচিত্তে ক্রয় করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে। শুধু অপচয় আর অপচয়!

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের বড় অংশ আসে 'ইলিশ' রপ্তানি থেকে। এই মৌসুমটা ইলিশের প্রজননের সময়। সরকারীভাবে নিষেধ থাকলেও পহেলা বৈশাখের চাহিদা মেটাতে ও অধিক মুনাফার আশায় জেলেদের মাছ ধরা কিন্তু থেমে নেই। বৈশাখের সকালে তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙ্গালীরা খুব আরাম করে পান্তা আর ডিম ওয়ালা ইলিশ ও জাটকা খাচ্ছে। এতে ভেঙ্গে যাচ্ছে ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র, ধ্বংস হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় কর না, তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই...' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

এধরণের অপসংস্কৃতির নামে বিলাসিতা আর লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় না করে যদি অসহায় গরীব-দুঃখীদের সাহাযার্থে খরচ করা হত তাহলে কতইনা ভাল হত!

১২. শিরকী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ :

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গল অর্জনের সম্পর্ক রয়েছে বলে কোন কোন সূত্র দাবী করে, যা কি-না স্পষ্ট শিরকী চিন্তাধারা। তারা বলে নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি।

পর্যালোচনা :

প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের কোন তত্ত্ব ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি পূজারী মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার অংশ মাত্র। ইসলামে এ ধরণের কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই মুহূর্তকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যয় করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, নতুবা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, নববর্ষের প্রারম্ভের সাথে কল্যাণের কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরক করল। যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ এই উপলক্ষ দ্বারা মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে সে ছোট শিরকে লিপ্ত হ'ল, আর কেউ যদি মনে করে যে, নববর্ষের আগমনের এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় শিরকে লিপ্ত হ'ল। যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করার জন্য যথেষ্ট। আর এই শিরক এমন অপরাধ যে, শিরকের ওপর কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'নিশ্চয় যে কেউই আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর তার বাসস্থান হবে অগ্নি এবং যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদা ৫/৭২)*। সুতরাং মুসলিমদেরকে এ ধরণের কুসংস্কার ও কু-প্রথা পরিত্যাগ করে ইসলামের যে মূলতত্ত্ব সেই তাওহীদ বা একত্বের ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আমাদের আহ্বান :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, '...তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় হওয়া যরূরী, যারা (মানুষকে) কল্যাণ (কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলাম)-এর দিকে ডাকবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও

অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে...' *(আলে ইমরান ৩/০৪)*। মূলতঃ কথিত 'পহেলা বৈশাখ' নামক বিধর্মীদের অনুকরণে যে উৎসব হয় তাতে কোটি কোটি নামধারী মুসলিম নানাবিধ কুফর ও শিরকী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই একজন মুসলিম হিসাবে এদেরকে নিষেধ করা সর্বোপরি আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। অতএব বছরের অন্যান্য দিনের ন্যায় নববর্ষের দিনকে গণ্য করতে হবে। এতে কোন ধরণের অনুষ্ঠান করা, তাতে অংশ নেওয়া এবং সহযোগিতা করা যাবে না। আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের দ্বারা নববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। যেসব ব্যক্তি নিজ ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কর্তব্য হবে অধীনস্থদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, এই নির্দেশ জারি করতে পারেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে নববর্ষকে উপলক্ষ করে কোন ধরণের অনুষ্ঠান পালিত হবে না। নববর্ষ উপলক্ষে কেউ বিশেষ পোশাক পরিধান কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময় করবে না। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন তথা প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া সহ বিভিন্ন মাধ্যমে এ বিষয়ে ইসলামিক দৃষ্টিকোণে বেশী বেশী প্রবন্ধ লেখা ও আলোচনা করা। মসজিদে ইমামগণ এ বিষয়ে মুছল্লীদের সচেতন করবেন ও বিরত থাকার উপদেশ দিবেন। পরিবারের প্রধানগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে, তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সবাইকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আমি দায়িত্বশীল, অনুরূপ ব্যক্তি তার পরিবারের জিম্মাদর। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীল। অতএব তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তার দায়িত্বশীল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'। অতএব যার অধীনে যারা রয়েছে তাদের দেখা-শুনা করা, দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের পথ বাতলানো এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা তার দায়িত্ব। যে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তার জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান, আর যে নিজ দায়িত্বে অবহেলা করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বুখারী হা/৪৮২৬; মুসলিম হা/৩৪১৪)*।

উপসংহার :

অপসংস্কৃতি মুসলিম যুবসমাজের সিংহভাগকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যহীন মোহগ্রস্ত জীবনের পথে ঠেলে দিচ্ছে। বস্তাপচা সংস্কৃতির প্রধানতম শিকার হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জীবন থেকে একটি বছর খসে পড়ার মূল্যবান ক্ষণে আত্মজিজ্ঞাসা না করে হতভাগা মুসলিমগণ আনন্দ-উল্লাস করে পরকালকে ভুলে যাচ্ছে। আল্লাহকে না ডেকে মুশরিকদের মত হাস্যকরভাবে বৈশাখকে ডাকছে। যার ফলে প্রতি বছরই বৈশাখ আগমন করে কাল বৈশাখী ঝড় নিয়ে। বৈশাখকে আমরা না ডাকলেও সে আসবে। তবুও বৈশাখের রবকে না ডেকে অযথা বৈশাখকে ডেকে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি। অতএব হে তরুণ মুসলিম যুবসমাজ! অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে ফিরে এসো মহা সত্যের পথে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন!!

[লেখক : চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

রামাযান সংক্রান্ত যরূরী দো'আ সমূহ

(১) নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ.

অর্থ : 'আল্লাহ্ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাতে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাতে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাতে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশি হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬)*।

(২) ইফতারের দো'আ : ছায়েম بسم الله 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি) বলে ইফতার শুরু করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। উল্লেখ্য, সমাজে ইফতারের একটি দো'আ আছে, যা যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮)*। দো'আটি নিম্নরূপ : اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ।

(৩) ইফতার শেষের দো'আ : ছায়েম ইফতার শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল-হামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) বলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*। তবে অন্য আরেকটি দো'আ পড়া যায়। যেমন- ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ' (তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩, সনদ হাসান)*।

(৪) লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : রাসূল (ছাঃ) লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রিগুলোতে বেশী বেশী যে দো'আটি পড়তে বলেছেন সেটি হল : اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী) অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১, সনদ ছহীহ)*।

(৫) সাইয়েদুল ইস্তেগফার :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি আপনার দাস। আমি আমার সাধ্যমত আপনার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে আপনার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

(৬) সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ : بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– **অর্থ :** 'আমি ঐ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, যার নামে আরম্ভ করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাহ'লে কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)

জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

লক্ষণীয় যে, এখানে বিষয়বস্তু হিসাবে ধরা হয়েছে হাদীছের অনুসরণ বনাম প্রচলিত মাযহাবী ফিক্‌হের অনুসরণ। লোকেরা নিশ্চয় এ দু'টি বিষয়কে এক বস্তু ধরে নিয়েছিল। আর এই ভুল ধারণা দূর করাই ছিল মাওলানা বেলায়েত আলীর অত্র পুস্তিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য। এই পুস্তিকায় তিনটি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় দ্বীনের বুঝ ও তার ফযীলতের উপরে। ২য় অধ্যায় তাক্বলীদ জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে এবং ৩য় অধ্যায় কুরআন ও হাদীছ সহজবোদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। প্রথম অধ্যায়ে দ্বীনের বুঝ হাছিল করার ফযীলত ও তাৎপর্য বর্ণনা করার পর কুরআন ও হাদীছে চিন্তা ও গবেষণা করার বিষয়ে লোকদের কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন- 'কুরআন ও হাদীছকে দেখা ও গবেষণা করার বিষয়টি লোকেরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কোন কথা কোন ফিক্‌হের কিতাবে দেখলেই তা কুরআন ও হাদীছের সপক্ষে না বিপক্ষে তার বাছবিচার না করেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো কুরআন-হাদীছের পাতা উল্টেও দেখে না। কিছু লোক দেখলেও তা বুঝতে চেষ্টা করে না। কিছু লোক বুঝলেও তা কেবল ক্বিয়ামত, বরযখ, দুনিয়া ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ক নছীহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরী'আতের হুকুম-আহকাম বিষয়ে তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আগেকার ফক্বীহগণ এসব বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন। অতএব এদিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা যদি কুরআন ও হাদীছে তাদের মাযহাবী কিতাবের খেলাফ কোন হুকুম দেখতে পান, তবে তাদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেদের কিতাবের সপক্ষে করে নেন। কিন্তু এটা বুঝতে চান না যে, কুরআন ও হাদীছের তাবেদারী করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেউ কেউ এসব ব্যাপার হ'তে পালাতে চান এবং চোখ বুঁজে থাকেন। এইসব জ্ঞানীদের সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেন, رب حامل فقه غير فقيه 'অনেক ফকীহ আছেন, যারা প্রকৃত অর্থে 'ফক্বীহ' বা জ্ঞানী নন'। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এদের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা করুন'।[২২]

দ্বিতীয় অধ্যায় **'তাক্বলীদ'** সম্পর্কে তিনি বলেন-

'যে ব্যক্তি নিরক্ষর লেখাপড়া জানে না, আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা ভিন্ন যার কোন উপায় নেই, তিনি হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ (علماء محدثين) কোন আলেম যিনি দ্বীনদার, আল্লাহভীরু, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ, তাঁর কাছে গিয়ে এভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করবেন যে, আমাকে এই মাসআলায় 'মুহাম্মাদী' তরীকা বাৎলিয়ে দিন'।[২৩]

অর্থাৎ মাওলানা বেলায়েত আলীর নিকট কোন জাহিলের জন্যও তাক্বলীদ যরূরী নয়। মুক্বাল্লিদগণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি কাউকে তার মাযহাবী ফিক্‌হ অনুযায়ী ফৎওয়া চাওয়ার বিরোধিতা করেছেন এবং নির্দিষ্ট কোন ফকীহ নয় এবং যে কোন মুহাদ্দিছ আলেমের নিকট হ'তে মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী ফৎওয়া চাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বেলায়েত আলীর সময়ে আহলেহাদীছগণ 'মুহাম্মাদী' নামেই পরিচিত ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, 'মুজতাহিদগণের কিতাবে যদি খেলাফ কিছু বেরিয়ে আসে, তবে সেদিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীছকে আঁকড়িয়ে ধরা অবশ্য কর্তব্য। নইলে মুজতাহিদ ইমামগণের কথা দ্বারা কুরআন-হাদীছ 'মানসূখ' হওয়ার শামিল হবে'।[২৪]

এরপর তিনি বলেন-

'হাদীছসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্র রয়েছে। কিন্তু মুজতাহিদগণের কথার কোন সনদ নেই। ... ইমামদের নিকট হ'তে প্রথম কে শুনলেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে কে শুনলেন, তাদের জীবনবৃত্তান্ত কেমন, এসব বিষয়ে বর্ণনাকারীদের পুরো অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত শর্তানুযায়ী ওয়াকিফহাল না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐসব কথারই বা কি মূল্য আছে? কে জানে যে এগুলি ইমামের কথা না অন্য কেউ নিজের পক্ষ হ'তে জুড়ে দিয়েছে? যেমন কতগুলি নাদান ধোকাবশতঃ কতগুলি ডাহা মিথ্যা কথা ইমাম আযমের দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপরে একমত যে, 'মুজতাহিদের রায় কখনো ভুল হয়, কখনো সঠিক হয়'। অতএব বুঝা গেল হাদীছ, যা একজন মা'ছূম রাসূলের সনদযুক্ত বাণী, তার মুকাবিলায় এমন কথা যা বে-সনদ ও ত্রুটির আশংকাযুক্ত, তার কোনই মূল্য নেই'।[২৫]

মুক্বাল্লিদগণ প্রকাশ্য হাদীছের বিরোধিতা করার পক্ষে সাধারণতঃ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, আমাদের ইমাম ছাহেবও নিশ্চয় অন্য কোন একটি হাদীছের উপরে তাঁর মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। এবিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী বলেন- 'মুজতাহিদগণের বহু কথা যে হাদীছের খেলাফ পাওয়া যায়, তার কারণ এই যে, তাঁদের সময়ে হাদীছসমূহ বিক্ষিপ্ত ছিল। যে সবের নিয়মমাফিক সংকলন তখনও পর্যন্ত হয়নি। সেকারণে তাঁদের সম্মুখে সমস্ত হাদীছ মওজুদ ছিল না। আর এজন্যে তাঁরা ইজতিহাদ ও কিয়াসের ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন'।[২৬] তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি তাক্বলীদী সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে আমল বিল-হাদীছের প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যা আহলেহাদীছ আন্দোলনের বক্তব্যের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপর আমরা মাওলানা বেলায়েত আলী রচিত 'তায়সীরুছ ছালাত' (تيسير الصلوة) বা 'সহজ ছালাত শিক্ষা' পুস্তিকার প্রতি নযর দেব। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদীছের বরাতে আহলেহাদীছদের গৃহীত মাসআলা সমূহের প্রচার করে গিয়েছেন। যেমন ওযু ও ছালাতের শুরুতে মুখে প্রচলিত আরবী নিয়ত পাঠ বিদ'আত হওয়া, দুইটি বড় মশকভরা (قلتين) পানি

২২. বেলায়েত আলী, আমল বিল-হাদীছ; গৃহীত : 'রাসায়েলে তিস'আ পৃঃ ৩২-৩৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পাক থাকা, দুধপানকারী ছেলের পেশাব কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা ও মেয়ের পেশাব লাগলে কাপড় ধুয়ে ফেলা, সফরের হালতে দুই ওয়াক্তের ছালাত প্রথম ছালাতের আউয়াল ওয়াক্তে বা শেষ ওয়াক্তে জমা করে পড়া, ছালাতে জানাযায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ইত্যাদি।

মাওলানা বেলায়েত আলীর অন্যতম পুস্তিকা হ'ল 'রিসালা-ই-দাওয়াত' (رساله دعـوت)। উর্দূ ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকায় তিনি নিজেদের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' (محمـــدى) হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং সকল মুসলমানকে উক্ত জামা'আতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উক্ত বইতে কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয়- (১) তিনি নিজের দলকে 'মুহাম্মাদী দল' (گـروه محمـــدى) বলেছেন। যেকোন বিদ্বান জানেন যে, মুহাম্মাদী, সালাফী, আহলেহাদীছ সব একই দলকে বলা হয়ে থাকে। মুক্বাল্লিদগণ উক্ত নামে অভিহিত হন না। (২) শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ছিল এ দলের আপোষহীন সংগ্রাম। আহলেহাদীছগণ এব্যাপারে আজও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। (৩) পীর-মুরীদ ও ধর্মব্যবসার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে কুরআন-হাদীছ পরিত্যাগ করার জাহেলী রীতির বিরোধিতা। আজও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছগণ এ ব্যাপারে সোচ্চার।

মাওলানা বেলায়েত আলীর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ তাঁর মুক্বাল্লিদ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

মাওলানা বেলায়েত আলীকে 'হানাফী' প্রমাণ করার জন্য সচরাচর তাঁর একটি উক্তিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে, যেখানে তিনি নিজেকে حنفـى المـذهب বা 'হানীফী' বলেছেন। কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন, সেটা যদি পুরা সামনে রাখা যায়, তাহ'লে আসল সত্যটি খুব সহজে বেরিয়ে আসবে। আমরা এখানে 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' থেকে পুরা উদ্বৃতিটাই নকল করব। মাওলানা বেলায়েত আলীর জীবনীকার ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী বলেন-

'এই সত্যদলের সনৈঃ সনৈঃ তারাক্কী ও কুরআন-হাদীছের প্রচার দেখে সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ গাযীপুরীকে দু'হাযার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাযারার জন্য দাওয়াত করে। মুনাযারার দিন মাওলানা এনায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিমন্ত্রণ করেন। বহু আলেম-ফাযেল ও গণ্যমান্য লোক জমায়েত হন। মাওলানা বেলায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহকে পৃথক একটি কামরায় ডেকে নিয়ে কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে বলেন, 'আমি হানাফী (مين حنفي المذهب هـــون) এবং এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, যদি কোন হানাফী কোন গায়র মানসূখ প্রকাশ্য হাদীছ দেখে কোন ফেক্বহী মাসআলার খেলাফ আমল করে, তবে সে ব্যক্তি হানাফী মাযহাব হ'তে খারিজ হয় না'। যেমন ইমাম আবু হানাফী (রহঃ) বলেছেন, 'রাসূলের হাদীছের মুকাবিলায় আমার কথা পরিত্যাগ কর (أترکو قولي بخبر الرسول)'।

মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যে মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ নিশ্চিন্ত হন এবং বেরিয়ে এসে জোরেশোরে ঘোষণা দেন যে, এই জামা'আত হক-এর উপরে আছে। হাদীছের উপরে আমল করার কেউ হানাফিয়াত থেকে খারিজ হয়ে যায় না। এতে মৌলবী ছাহেব ফিরে এলে তাঁকে দারুণভাবে অপমানিত ও লজ্জিত করা হয়।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনার প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা প্রতীয়মান হয়ে যে, মাওলানা বেলায়েত আলী এখানে নিজেকে হানাফী এজন্য বলেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফর নির্দেশ অনুযায়ী হাদীছবিরোধী মাসআলাগুলি ত্যাগ করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করেছেন। এটা নয় যে, সাধারণ হানাফীদের মত ফিক্বহের কিতাব সমূহ লিখিত ভুল-শুদ্ধ সবকিছুর তিনি অন্ধ তাক্বলীদ করতেন। এটা বরং ইমাম আবু হানীফার উপরোক্ত নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতার শামিল। এখানে মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যটি তর্কের খাতিরে সাময়িক স্বীকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সাধারণতঃ তর্কস্থলে বলা হয়ে থাকে।

মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় উস্তায আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মাওলানা এনায়েত আলীর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে বিশেষ করে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), বিহার ও বাংলায় ব্যাপকহারে আহলেহাদীছ মাসলাক ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুর রহীম ছাদিকপুরী মাওলানা এনায়েত আলী সম্পর্কে বলেন-

'তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর বাংলাদেশ এলাকার গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ধৈর্য সহকারে সফর করেন ও লাখো মানুষের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর চেরাগ জ্বালিয়ে দেন। সকলকে কুরআন ও হাদীছের ইত্তেবার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁর অনুসারীগণ আজও বাংলা অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' লকবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছেন'।[২৮]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর, নারায়ণপুর ইত্যাদি গ্রাম সফর করেছিলেন। ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় পত্রিকা 'আখবারে আহলেহাদীছ-এ নিজের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন- 'আমি এই সফরে একটি কথাই কেবল চিন্তা করেছি যে, বাংলাদেশে আহলেহাদীছের এত সংখ্যাধিক্য কিভাবে হ'ল? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এসবই মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনেরই বরকত'।[২৯]

কোন হানাফী মুক্বাল্লিদের তাবলীগের ফলে লোকেরা তাক্বলীদ ছেড়ে আহলেহাদীছ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব মাওলানা বেলায়েত আলী, ছাদেকপুরী পরিবার ও তাঁদের অনুসারী মুজাহিদগণের অধিকাংশই জিহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনেও যে অবদান রেখেছিলেন, তা বলা যেতে পারে।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৯৭-৩০২]

---

২৭. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩৫; গৃহীত : তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ১১৯।

২৮. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩৭; গৃহীত : তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ১২৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭; গৃহীত : সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' অমৃতসর-পূর্ব পাঞ্জাব : ১০ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩।

আহলেহাদীছ পরিচিতি

-আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও পটভূমি সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা ও সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও প্রধানতঃ অজ্ঞতা এবং আনুসঙ্গিকভাবে দলীয় স্বার্থপরতায় বশবর্তী হইয়া ঘরে ও বাহিরে অর্থাৎ মুসলিম সমাজের মধ্যে ও মুসলিম বিরোধী দল সমূহের পক্ষ হইতে নানারূপ বিভ্রান্তি ও প্রহেলিকা দীর্ঘকাল হইতে সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিণতি স্বরূপ মুসলিমগণের বিভিন্ন দলীয় শাখা ও উপশাখাগুলি এই আন্দোলনকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি স্বতন্ত্র ফের্কারূপে ধারণা করিতেছেন এবং এই কারণে স্বয়ং আহলেহাদীছগণের এই আন্দোলনকে তাঁহাদের সুবিধাবাদ নীতির অন্তরায় মনে করিয়া বিভিন্ন পথে ও মতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। আহলেহাদীছগনের চৈতন্য সম্পাদন এবং সর্বসাধরণ মুসলিম জনগণের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অপনোদনকল্পে ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীবৃন্দের মধ্য হইতে তিনজন শীর্ষ স্থানীয় মহাবিদ্বানের আহলেহাদীছ আদর্শ ও পথ সম্পর্কিত অভিমত নিম্নে উদ্বৃত করা হইল।

ইমাম ইবনু হযম :

আহলেহাদীছগণের অন্যতম প্রথিতযশা অধিনায়ক স্পেনের ইমাম ইবনু হযম একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি ৪৫৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, উছূল, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত ও তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে অতুলনীয় আসন অধিকার করিয়াছিলেন, বিদ্বানগণের তাহা অবিদিত নাই। তিনি আহলেহাদীছ পথের মূলনীতি সম্পর্কে 'আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম' নামক এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এবং তাঁহার অমর ও অনবদ্য 'আল-মুহাল্লা' নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে আহলেহাদীছগণের মূলনীতি আলোচিত হইয়াছে। আহলেহাদীছগণের মূলনীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী সম্পর্কে উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার উক্তি নিম্নে সংকলিত হইল।[৩০]

ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলিয়াছেন,

(١) دين الاسلام اللازم لكل احد لا يوخذ الا من القران او مما يصح عن رسول الله صلي الله عليه و سلم.

(১) 'ইসলাম প্রত্যেকের জন্য অবধারিত করিয়া দিয়াছে যে, কুরআনে অথবা যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সঠিকভাবে প্রমাণিত এতদুভয় ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রাহ্য হইবে না'।

(٢) أما برواية جميع العلماء الامة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلوة والسلام وهو نقل الكافة_وأما برواية لثقات واحدا عن واحد حتي يبلغ إليه عليه الصلوة و السلام ولا مزيد.

(২) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে সকল উক্তি ও আচরণ উম্মতের সমুদয় আলেম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম 'ইজমা'। উহা যেরূপ প্রণিধানযোগ্য, সেইরূপ একদল বিদ্বান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য গ্রহণীয় এবং উহাকে সকল বিদ্বানের সর্বসম্মত বর্ণনার ন্যায় মান্য করিয়া লইতে হইবে, অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সকল উক্তি বা আচরণ একজন করিয়া বিশ্বস্ত রাবী-বর্ণনাদাতা আর একজন বিশ্বস্তের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়া উহাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন, তাহাও মান্য করিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত আবশ্যক নয়'।

প্রমাণ :

আল্লাহ বলিয়াছেন,

(١) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

(১) 'রাসূল (ছাঃ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কিছুই উচ্চারণ করেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন, অহি-র দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই বলিয়া থাকেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন,

(٢) اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ..

(২) 'তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তোমরা (কেবল) তাহারই অনুসরণ করিয়া চল, তাঁহাকে ছাড়া অপর অভিভাবকগণের অনুসরণ করিও না' *(আ'রাফ ৭/৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলিয়াছেন,

(٣) اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...

(৩) 'অদ্যকার দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণতা দান করিলাম..' *(মায়েদা ৫/৩)*।

(٣) قال تعارض فيما يري المرء أيتان وحديثان و صحيحان او حديث صحيح وأية فالواجب استعمالهما جميعا- لان اطاعتهم سواء في الوجوب, فلا يحل ترك احدهما الاخر مادمنا نقدر علي ذلك-وليس هذا بان يستثني الاول معاني من الاكثر فان لم نقدر علي ذلك وجب اخذ بالفوائد حكما لانه تيقن وجوبه ولا يحل ترك اليقين بالظنون ولا اشكال في الدين.

(৩) 'যদি কোন ব্যক্তি দুইটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে কিংবা একটি ছহীহ হাদীছ ও একটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায়, তাহা হইলে উভয় আদেশই প্রতিপালন করা ওয়াজিব হইবে। কারণ উভয়ের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া তুল্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় আদেশের উপর আমল করা সম্ভবপর, ততক্ষণ একটি আদেশের জন্য অপর আদেশ বর্জন করা সিদ্ধ হইবে না। বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীছের সমকক্ষতায় সংক্ষিপ্ত হাদীছ গ্রহণ না করা হাদীছ বর্জন করার পর্যায়ভুক্ত হইবে না। বিস্তারিত হাদীছে যাহা অতিরিক্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই গৃহীত হইবে। কারণ তাহার ওয়াজিব হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আর যাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, তাহা কাল্পনিক কারণে পরিত্যক্ত হইতে পারে না এবং দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ জটিলতা নাই'।

---

৩০. ইমাম ইবনু হয্‌মের জীবনী সম্পর্কে তর্জুমানুল হাদীছের তৃতীয় বর্ষ, ১১শ/১২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(٤) الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة, و كذالك ما لم يروه الا من يشق بدينه و حفظه.

(৪) 'মওকূফ ও মুরসাল হাদীছ দ্বারা কোন বিষয় সাব্যস্ত হইতে পারে না। আবার যে সকল রাবীর ধর্মপরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য তাঁহাদের ছাড়া অন্যের হাদীছ গৃহীত হইবে না'।

(٥) ولا يحل ترك ماجاء في القران وصح عن رسول الله صلي الله عليه و سلم ليقول صاحب او غيره سواء, كان هم راوي ذلك الحديث او لم يكن.

(৫) 'কোন ছাহাবী বা অন্য কেহ, যদি তিনি সেই হাদীছের রাবীও হন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ পরিহার করা সিদ্ধ হইবে না'।

(٦) ولم يختلف احد من الامم في ان رسول الله صلي الله عليه و سلم بعث الي الملوك رسولا. رسولا واحدا إلي كل مملكة يدعوهم إلي الاسلام. واحدا واحدا الي كل مدينة والي كل قبيلة. كصنعا الجند وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وعيرها. يعلمهم احكام الدين كلها. وافترض علي اهل كل جهة قبول رواية اميرهم و معلمهم فصح قبول خبر الواحد الثقة عن اسنا مبلغنا الي ان رسول الله صلي الله عليه و سلم.

(৬) 'উম্মতের মধ্যে কাহারো এ বিষয়ে মতভেদ নাই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাজন্যবর্গের নিকট তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক রাজ্যে ইসলামের পথে আহ্বান করিবার জন্য এক এক জন করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গোত্রে যথা : ছান'আ, হাযারামওত, তিমিয়া, নাজরান, বাহরায়েন ও আম্মান প্রভৃতি জনপদে শুধু এক একজন করিয়া দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধর্মের বিধিনিষেধ সমস্তই উক্ত জনপদ সমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং কথিত অঞ্চল সমূহের অধিবাসীবৃন্দের উপর তাহাদের শিক্ষক ও নেতার বর্ণনা মান্য করা ওয়াজিব বলিয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, একজন বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনা (খবরে-ওয়াহেদ) অনুরূপ এক একজন বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রমাণিত হইলে তাহা অবশ্য গ্রহণীয় হইবে'।

(٧) والقران ينسخ لقران ولسنة تنسخ السند والقران.

(৭) কুরআনের এক আয়াত শুধু অপর আয়াতকেই মানসূখ করিতে পারে, পক্ষান্তরে হাদীছ কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীছকেও মানসূখ করিতে পারে'।

(٨) و من فضل اصحاب عند الله بوجب تثليد قوله وتأويله, لانه تعالي لم يامر بذلك ولكن موجب تعظيمه ومحبته وقبول ورايته فقط. لان هذا هو الذي اوجب الله تعالي.

(৮) আল্লাহ্র নিকট ছাহাবীগণ মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে ব্যক্তি বিশেষের তাক্বলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) করা বা ব্যক্তি বিশেষের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মান্য করা ওয়াজিব হইবে না, কারণ আল্লাহ সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের পদমর্যাদার দরুণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে, সম্মান করিতে এবং তাঁহাদের বর্ণনা মান্য করিতে হইবে, ইহাই আল্লাহ্র আদেশ'।

(٩) ولا يحل لاحد ان يقول في أية او خبر او في خبر عن ان رسول الله صلي الله عليه و سلم ثابت هذا منسوخ و هذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه. ولا ان هذا لحكم غير واجب, من حين وردوه الا بنص اخر وارد, بان هذا النص كما ذكروا باجماع متيقن بانه كما ذكر رضرورة موجبة انه ذكر والافهو كاذب

(৯) 'কোন আয়াত বা প্রমাণিত হাদীছ সম্বন্ধে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, উহা মানসূখ প্রত্যাহৃত বা তাহার স্পষ্ট ব্যাপক অর্থ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। স্পষ্ট অর্থের বিপরীত উহার পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার কিংবা উক্ত আদেশ ওয়াজিব নয়-এরূপ মন্তব্য করা অবৈধ। কারণ নির্দেশের সূচনা হইতে উহার অনুসরণ ওয়াজিব রহিয়াছে, অবশ্য যতক্ষণ না কুরআনের অপর কোন আয়াত বা ছহীহ হাদীছ দ্বারা ঐ সকল কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় অনুরূপ স্পষ্ট নির্দেশ অথবা প্রামাণ্য ইজমা (যাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে) বা প্রত্যক্ষ সন্দেহাতীত প্রমাণ ব্যতীত নসখের বা বর্ণিত অপরাপর দাবী উপস্থিত করা বিধিসঙ্গত হইবে না, করিলে সে মিথ্যাবাদী স্থিরীকৃত হইবে'।

(١٠) والاجماع هو ما تيقن ان جميع اصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم عرفوا به وقالوا به, ولم يختلف منهم احد كيقينا انهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه الصلوة والسلام الصلوات الخمس, كما هي في عدد ركوعها وسجودها او علموا انه صلاها مع الناس كذلك, وانهم كنهم صلوا وعلموا انه صام مع الناس رمضان في ايحضر, وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين والتي من لم يقل بها لم يكن من المومنين.

(১০) 'ইজমার জন্য এরূপ অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক, যাহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমস্ত ছাহাবী উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন এবং সকলেই তাহা বলিয়াছেন, একজনও ভিন্নমত হন নাই। যেমন আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ঠিক ছালাতের রুকূ' ও সেজদার সংখ্যা মত যেরূপ আমরা অবগত আছি, এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের সঙ্গে ঐভাবেই ছালাত আদায় করিতেন এবং তাঁহারাও তাঁর সঙ্গে অনুরূপ ছালাত আদায় করিতেন। অথবা যেমন তাঁহারা অবগত ছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ (ছঃ) নিজগৃহে অবস্থানকালে সকলের সঙ্গে ছিয়াম রাখিতেন এবং তাঁহারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমভিব্যবহারে ছিয়াম প্রতিপালন করিতেন। এইরূপ শরী'আতের সমুদয় আদেশ-নিষেধ, যেগুলি অবিসম্বাদিত প্রমাণিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর সর্বসম্মত নির্ধারণগুলি যাহারা স্বীকার করিবে না, তাহারা মুমিন পর্যায়ভুক্ত নয়'। *[ক্রমশঃ]*

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ১১৩-১১৯]

আরাফার খুৎবা

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

শাইখ আবদুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ আলে শাইখ
আরাফার খুতবা ১৪৩৫ হি. ২০১৪ খৃঃ

হে আল্লাহ! সমস্ত স্তুতি তোমার জন্য। তুমি আমাদের সৃজন করেছ মাটি থেকে। বড় করেছ ছোট থেকে। সবল করেছ দুর্বলতা থেকে। ধনবান করেছ নির্ধনতা থেকে। চক্ষুষ্মান করেছ অন্ধত্ব থেকে। শ্রবণক্ষম করেছ বধিরতা থেকে। জ্ঞানবান করেছ মূর্খতা থেকে। সুপথ দেখিয়েছ পথভ্রষ্টতা থেকে। তোমার প্রশংসা ঈমান দান করার জন্য। তোমার প্রশংসা কুরআন নাযিল করার জন্য। তোমার প্রশংসা পরিবার, ধন-দৌলত ও সুস্থতার জন্য। তুমি আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করেছ, আমাদের নিরাপত্তা বিধান করেছ। হে রব! তোমার কাছে যাই চেয়েছি, তুমি তাই আমাদের দিয়েছ। অতএব তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা যাবৎ তুমি সন্তুষ্ট হও। তোমার জন্য প্রশংসা সন্তুষ্টির পরেও।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর এবং তাঁর পরিজন ও ছাহাবীদের উপর।

আল্লাহ্র বান্দারা! আমি আপনাদের এবং প্রথমত নিজের পাপাচারী ক্ষুদ্র অন্তরকে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা সব কল্যাণকর্মের সমন্বয়ক। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

‘যে আল্লাহ্র তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! আজ জুম‘আ বার। আজকের দিনটিই আবার ‘আরাফা দিবস’। আপনারা জানেন ‘আরাফা দিবস’ কী? এ মহান দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেন। এদের নিয়ে গর্ব করেন ফেরেশতাদের সামনে। আল্লাহ্র রহমতের ব্যপ্তি কেমন দেখুন। আরাফার এ অবস্থানস্থলে বান্দারা পাপরাশি নিয়ে সমবেত হয়েছে। অথচ দয়ালু প্রভু তাদের নিয়েই ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করছেন। তাই যে কেউ জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় সে যেন আরাফার দিনটিকে লুফে নেয়। এ বার্তাটি আর কারও নয় সে মহামানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর, যিনি নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না; যা বলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই বলেন। তিনি বলেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আরাফার মত কোনদিন নেই যাতে আল্লাহ বেশী বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। আল্লাহ সেদিন নিকটবর্তী হন এবং এদের নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করে বলেন, ওরা কী চায়?’ *(মুসলিম হা/১৩৪৮)*।

যে কেউ তার চিরশত্রু ইবলীসকে পরাভূত করতে চায়, সেও যেন আরাফা দিবসটিকে কাজে লাগায়। তালহা বিন উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ.

‘শয়তানকে কখনো আরাফা দিবসের মতো এমন ছোট, হীন, পরাভূত ও ক্ষুব্ধ দেখা যায় না। আর তা এজন্য যে সেদিন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় এবং বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করা হয়।’ [মুওয়াত্ত্বা মালেক : ২৪৫, মুরসাল]

আরাফা দিবসে আরাফায় অবস্থান ও দু‘আর মাধ্যমে আপনি পারেন আমলনামা থেকে পাপগুলো মুছে ফেলতে। পারেন আপনাকে শয়তানের বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করার একটি পূর্ণ বছরের সাধনা এবং বিগত জীবনের পুরো প্রচেষ্টাকে মাটি করে দিতে। আরাফা দিবসে রহমতের মেঘমালা অবতীর্ণ হয়। আর তা ছেয়ে যায় এর অবস্থানকারীদের মাঝে। এ সম্পর্কে ফুযাইল ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর দারুণ এক উক্তি স্মরণীয়। আরাফায় মানুষের ক্রন্দনরোল দেখে তিনি বলেছিলেন,

أرايتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقاً أكان يردهم ؟ قيل لا قال والله للمغفرةُ عند الله عز وجل أهون من إجابة رَجُلٍ لهم بدانق.

‘তোমরাই বল, এত লোক যদি কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে সমস্বরে একটি মুদ্রার মাত্র এক ষষ্ঠাংশ প্রার্থনা করে তিনি কি তাদের আবেদন ফেলতে পারবেন? কখনোই না। আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র কাছে এদের ক্ষমা করা তাদের জন্য ওই লোকটির মুদ্রার ষষ্ঠাংশ দেয়ার চেয়েও সহজতর’।

এটি এমন এক দিবস, যা পেলে একে ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণে অভিশপ্ত ইহূদীরাও আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে। তারিক বিন শিহাব থেকে বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

'এক ইহূদী ব্যক্তি খলীফা ওমর (রাঃ)-কে বলল, আপনাদের কিতাবে আপনারা একটি আয়াত পড়েন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল হত, আমরা এ দিবসকে ঈদ হিসাবে পালন করতাম'। ওমর (রাঃ) বললেন, 'সেটি কোন্ আয়াত?' লোকটি বলল, 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। ওমর (রাঃ) বললেন, 'আমি অবশ্যই সে দিন এবং সে জায়গা সম্পর্কে অবগত যেখানে নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তিনি ছিলেন আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান। আর দিনটি ছিল জুম'আ বার' *(বুখারী হা/৪৫, মুসলিম হা/৩০১৭)*।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আরাফা এমন এক দিবস, যেদিন বান্দারা হাশরের ময়দানে নিজেদের সম্মেলনের কথা স্মরণ করে। এদিন তারা সবাই পার্থিব জৌলুস ও চাকচিক্য থেকে মুক্ত হয়। দু'টুকরা সফেদ কাপড় গায়ে জড়ায়। এ যেন তাদের কাফনের কাপড়। যেন তারা হাশরের মাঠে তাদের রবের সামনে দাঁড়ানোর জন্য পুনরুত্থিত হয়েছে। সবার কাঁধ আকাশ অভিমুখী। সবার স্বর দু'আ ও কান্নায় গুঞ্জরিত। পার্থক্য শুধু এতটুকু, এদিন দু'আ কবুল করা হবে। মাগফিরাত ও রহমত করা হবে। আর হাশরের দিন খাতাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। সুতরাং হিসাবের খাতা বন্ধ করার আগেই দিনটিকে কাজে লাগাতে হবে।

আরাফা ময়দানে হাজিরা ছাতা, তাবু ও গাড়ির আঁড়ালে ছায়া খোঁজেন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহ্র আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়াই থাকবে না। অতএব কেন আমরা হায়াতকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে লুফে নেব না। যাতে আগামীকাল তা কাজে লাগে। যেদিন সবাই দয়াময়ের আরশের ছায়ার জন্য হাপিত্যেশ করবে। আমরা কেন সেখানে ছায়া লাভকারী সাতশ্রেণীর কেউ হব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে সেদিন তাঁর আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হল- ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশা ২. ঐ যুবক, যার যৌবনকাল আল্লাহ্র ইবাদতে অতিবাহিত হয় ৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে (মসজিদের প্রতি তাঁর মন সদা আকৃষ্ট থাকে) ৪. ঐ দু'ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; এ ভালবাসায় তারা মিলিত হয় এবং এ ভালবাসা নিয়েই বিচ্ছিন্ন হয় ৫. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন উচ্চবংশীয় সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন মিলনে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি' ৬. ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তাঁর ডান হাত যা দান করে তার বাম হাত পর্যন্ত তা জানতে পারে না এবং ৭. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তাঁর উভয় চোখে পানি বয়ে যায়' *(বুখারী হা/১০৩১)*।

সর্বোপরি আরাফা দিবসে সারা বছর খুঁজে না পাওয়া মুসলিম জাতির একতার চিত্র ভেসে ওঠে। বর্ণ, ভাষা ও দেশের ভিন্নতা ঘুচে গিয়ে এদিন ঐক্যের অনুপম সুর বেজে ওঠে। সবার পোশাক এক। সবার শ্লোগান অভিন্ন। সবার কাজও এক। সবার রবও অভিন্ন।

হে আল্লাহ্র বান্দারা! আরাফা দিবসের উপযুক্ত মূল্যায়ন করুন। আরাফা দিবসের মর্যাদা কেবল হাজীদের জন্যই সীমিত নয়, বরং হজ্জে না আসাদের জন্যও এ দিবসে ছিয়ামের ন্যায় মহান ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফা দিবসের ছিয়াম সুন্নাত প্রবর্তিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আরাফা দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ '(এটি) বিগত ও আগত এক বছরের (গুনাহগুলোর) কাফ্ফারা স্বরূপ' *(মুসলিম হা/১১৬২)*।

হে আল্লাহ্র বান্দারা! একটি গুনাহর ক্ষতিপূরণও আমাদের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানে পুরো দু'টি বছরের কাফ্ফারা! অথচ অনেকে এদিনও নিষিদ্ধ কাজে ব্যস্ত থাকে। যেমন গান শোনা, চ্যানেলগুলোয় সম্প্রচারিত মন্দ ও অশ্লীলতার পেছনে পড়ে থাকে। আবার অনেকে এদিন বৈধ কাজেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম করে বলা যায় সেটি তার জন্য ক্ষতিকরই বটে। যেমন অনেকে এ মহান দিনে ছু'টি পেয়ে বিনোদনে ডুবে যিকর ও ইবাদতের সুযোগ হাত ছাড়া করে। হজ্জে আসতে না পারা সবাইকে আমি এদিন ছিয়াম রেখে যথাসম্ভব বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত, যিকর, দু'আ ও দয়াময়, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র কাছে বিনীত কান্নাকাটির উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[৯ যিলহজ্জ ১৪৩৫ হিঃ মোতাবেক ২০১৪ সালে মক্কার আরাফায় মসজিদে নামিরায় প্রদত্ত হজের খুৎবার সারসংক্ষেপ]

[সংকলিত]

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পাঁচটি মূলনীতি

(ক) কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।
(খ) তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন।
(গ) ইজতেহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ।
(ঘ) সকল সমস্যায় ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ।
(ঙ) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।

–বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

-লিলবর আল্-বারাদী

ভূমিকা :

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষা এমন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শকে আয়ত্ব করে। অর্জন করতে পারে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। মানব সমাজে ‘শিক্ষা’ হ’ল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের সফলতা ও বিকাশ লাভের অন্যতম বাহন হ’ল ‘শিক্ষা’। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় বিবেক ও সুপ্রবৃত্তি। এ জন্যই বলা হয়, শিক্ষাই হচ্ছে একটি সভ্য সমাজ ও জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং শিক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি কখনও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। সভ্যতা, সম্মান, মর্যাদা এবং সকল প্রকার সফলতা ও উন্নতির মূল চাবিকাঠি হ’ল শিক্ষা। শিক্ষার মানদণ্ডে প্রত্যেকের স্ব স্ব মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। আর শিক্ষার মর্যাদার মানদণ্ডে প্রকৃত মানুষ ও ইতর প্রাণী এ দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কারণ মানুষ যা শিখে তা-ই তার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে চায়। তাই বলা হয় যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, বাহ্যিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে জাতি তত বেশী উন্নত।

শিক্ষা হ’ল একটি সমাজ বা জাতির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। তাই শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানীগণ বহু হিতবাক্য উচ্চারণ করেছেন। ইংরেজীতে বলা হয়েছে, Education is the backbone of a nation. ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড’। সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়, *‘বিদ্যা সর্বস্য ভূষনম’*। ‘বিদ্যাহীন মানুষ অন্ধের সমতুল্য’। আর চোখ থাকলেও সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। অতএব বিদ্যা শিক্ষা করা অতীব যরূরী। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম (বিদ্যা) অর্জন করা ফরয’।[৩১]

প্রত্যেক ব্যক্তি খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তার স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার পূর্বেই তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যরূরী। তাই মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম শিক্ষা গ্রহণের আদব ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

‘পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক্ব’ থেকে। পড়, তোমার প্রতিপালক অতীব সম্মানিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না’ *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশী যে, মহান আল্লাহ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর সর্বপ্রথম বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ‘তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন সমস্ত কিছুর নাম, অতঃপর সেগুলি পেশ করলেন ফেরেশতাদের কাছে’ *(বাক্বারাহ ২/৩১)*।

শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বাংলা ‘শিক্ষা’ শব্দটি সংস্কৃত ‘শাস’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। ‘শাস’ অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। ‘শিক্ষা’ শব্দের সমার্থক ‘বিদ্যা’ শব্দটি সংস্কৃত ‘বিদ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ ‘জানা’ বা ‘জ্ঞান আহরণ করা’।[৩২] শব্দ দু’টি বিশেষ কৌশল অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং বুৎপত্তিগত অর্থে ‘শিক্ষ’ বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা কিংবা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করাকে বুঝায়।

বাংলা ‘শিক্ষা’ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘Education’। ‘Education’ শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ‘Educere’ শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করা কিংবা ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা (To lead out, to draw out)।[৩৩]

শিক্ষার পারিভাষিক অর্থ হ’ল, (ক) শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যার্জন করে এবং বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে পরিপক্ক করে সুপ্ত বিবেককে সর্বদা জাগ্রত রেখে শিক্ষার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে আত্মোন্নোয়ন বিকাশে নিজেকে পরিচালিত করা এবং অন্যকে পরিচালিত হওয়ার জন্য সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সাহায্য করাকে শিক্ষা বলে। (খ) ডঃ এ.কে.এম. ওবায়েদ উল্লাহ্‌র মতে, ‘নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করাকে শিক্ষা বলে’।[৩৪] (গ) শিক্ষাবিদ রেমেন্টের মতে, ‘শিক্ষা হ’ল মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্কতার স্তর অবধি বিকাশের একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়’।[৩৫] (ঘ) শিক্ষাবিদ ম্যাকেঞ্জীর মতানুসারে, ‘শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা আমাদের সারা জীবন ধরে চলতে থাকে এবং এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়’।[৩৬] (ঙ) শিক্ষার এ ব্যাপক অর্থ ব্যাখ্যা করে এ.এন. হোয়াইট হেড বলেছেন, ‘শিক্ষার একটিমাত্র বিষয়বস্তু আছে, তাহ’ল জীবনকে সর্বোতভাবে প্রকাশিত করা। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। মূলতঃ জীবন মানেই শিক্ষা’।[৩৭]

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব :

শিক্ষা দ্বারা বিদ্যা অর্জিত হয়। বিদ্যা জ্ঞানকে পরিপক্ক করে। আর জ্ঞান বিবেককে জাগ্রত রাখে। এই বিবেক দ্বারা অর্জিত জ্ঞান, শিক্ষার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিচালিত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত মানুষষের জন্য সর্বোত্তম নে’মত হ’ল বিবেক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ‘তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*।

---

৩১. ইবনু মাযাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮ ‘ইলম’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

৩২. ডঃ এ.কে.এম ওবায়েদ উল্লাহ, শিক্ষানীতি, ১ম সেমিষ্টার, পৃঃ-১৪।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৩৭. আহমাদ শরীফ, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আত-তাহরীক (২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-১৯৯৯), পৃঃ ২১।

Contents

সুস্থ বিবেক মানুষের সৌন্দর্যের প্রতীক। যা বিকাশে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সম্মান ও মর্যাদার সমকক্ষ কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা অর্জন, জ্ঞান গ্রহণ ও বিবেক জাগ্রত রাখার মাধ্যমে। এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় সাধিত হ'লেই চরিত্র ক্রটিমুক্ত এবং কলুষমুক্ত হবে। অর্থাৎ সম্মান, মর্যাদা ও উন্নতির মূল কাঠামো তৈরী হবে। একজন শিক্ষা অর্জনকারী ব্যক্তি প্রদীপের ন্যায়। পক্ষান্তরে একজন বিদ্যা বর্জনকারী ব্যক্তি আঁধারের সমতুল্য। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ 'বল, দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কী সমান হতে পারে? অথবা, অন্ধকার ও আলো কী কখনো সমান হতে পারে?' (রা'দ ১৩/১৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 'হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/২)*। শিক্ষা মানুষের অন্তরকে বিশেষভাবে আলোকিত ও পরিমার্জিত করে। প্রবাদ আছে, 'Knowledge is power and virtue but ignorance is sin'. 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পূণ্য কিন্তু অজ্ঞতা পাপ'।

মাদরাসা শিক্ষা বনাম সাধারণ শিক্ষা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু দেশের সরকার বিগত ৪০ বছরেও শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা প্রত্যেক অভিভাবক তার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যম প্রতিভার অধিকারী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অন্যদিকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মান নিম্নমানের হওয়ায় অভিভাবকরা আজ আশা-আকাঙ্খাহত।

মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা নামে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে চালু হয়। তাদের এই বিভক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করে নৈতিকতার মানদণ্ড স্বমূলে ধ্বংস করা। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে নাইট, নবাব, খানম প্রভৃতি বাহাদুরের মত আবোল-তাবোল উপাধিতে ভূষিত করে। অতঃপর সরকারী চাকুরীতে সুযোগ করে দিয়ে তাদের মায়াজালে আটকে ফেলে ইংরেজ বিরোধী জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিমুখ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের এ পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছিল তা আমরা পরিজ্ঞাত। কিন্তু এই উপমহাদেশে তাদের অনুকরণপ্রিয় কিছু নেতা স্মৃতিচারণ করে চলেছে, যা আমাদের সোনার ছেলেদের সোনালী ভবিষ্যত ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। অথচ লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, শিক্ষার হার গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত মান ও ছাত্রের নৈতিকতা জ্যামিতিক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এর একটিই কারণ বৃটিশদের রেখে যাওয়া ৭৭ বছরের পুরনো দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আজও অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছি। শিক্ষিত সমাজকে বিভক্ত করে তাদের চিন্তা-চেতনাকে দ্বিমুখী করে ফেলেছি। ফলে শিক্ষার মান ও শিক্ষিত সমাজ গোল্লায় যাচ্ছে।[৩৮] দ্বিমুখী শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার প্রকৃত মান আজ বিলুপ্তির পথে।

৩৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ, মাসিক আত-তাহরীক (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা-২০০৪), পৃঃ ৩।

বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব কমিটি গঠন করেছেন, সেখানে দেখা গেছে সবারই মূল টার্গেট ছিল মাদরাসা বা ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত রাখা। আর সাধারণ শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করার জন্য সফল পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকা। 'এনাম কমিটি' ও 'কুদরত-ই খুদা'-এর শিক্ষা রিপোর্ট এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।[৩৯] যার ধারাবাহিকতায় আজ আমরা সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষার অনুকূলে নয়। কারণ বর্তমান শিক্ষা সিলেবাসে ৮০০-১০০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ১০০ নম্বরের বরাদ্দ ইসলামী শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক অনিহাবশত সবশেষে পাঠদান করে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক মনযোগ থাকে না এবং স্বভাবতঃ এ বিষয়ের প্রতি বিরক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়।[৪০] উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে মাদরাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে। সেখানে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ২০০ নম্বর করে মান বণ্টন করে আরবী শিক্ষার দ্বারকে সংকুচিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ফলে মাদরাসার ছাত্ররাও দারুণভাবে বিপাকে পড়েছে।

ইসলামী নীতিশিক্ষা ব্যতীত নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা কখনও হিতকর নয়। অথচ আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তা তথাকথিত শিক্ষাবিদরা শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস থেকে ইসলামী নীতিশিক্ষাকে বর্জন করার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ ইসলাম শিক্ষাই তাদের প্রধান টার্গেট। ইসলাম বা ধর্ম শিক্ষা বর্জন করলে, নীতি-শিক্ষা তার সঙ্গেই বিদায় হয়। কেননা ইসলাম বা ধর্ম শিক্ষা ব্যতিরেকে নীতি-শিক্ষা অর্থহীন।[৪১]

সুধী পাঠক! এই দ্বিমুখী ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিহত করে ইসলামী শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় শিক্ষা হিসাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এতে সর্বস্তরে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে একক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত মান বৃদ্ধি করতে হবে। যা সম্ভব। এছাড়াও বিভাগ বা বিষয় ভিত্তিক সমন্বয় করে দক্ষ ও যোগ্য জনবল দ্বারা প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম, খত্বীব, দাঈ, মুফতী, মক্তবের শিক্ষক, হাফেযে কুরআন, কাযী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারকে উক্ত অবশ্যকীয় দায়িত্বে জনশক্তি নিয়োগের জন্য একক বা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই পৃথক পৃথক বিভাগ খোলার পথ নিশ্চিত করতে হবে।[৪২]

সহশিক্ষার কুফল ও প্রতিকার :

বর্তমান সমাজের জন্য সহশিক্ষা একটি মহা অভিশাপ। কেননা নারী-পুরুষের যৌবনের বসন্তকাল অতিবাহিত হয় এই সময়ে। আর এর সুবাদে অনেক তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম বিনিময় করার সুযোগ পায়। এমনকি বিভিন্ন প্রকার অবৈধ অনাচার ও আইন পরিপন্থী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়। মা-বাবার নয়নের মণি হয়ে যায় এক সময় বখাটে, সন্ত্রাসী, মাস্তান, দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি। যা একটি সামাজিক অবক্ষয়।

এছাড়াও নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে বসা, যুবক-যুবতী এক সাথে অর্ধনগ্ন পোশাক পরে সুইমিং পুলে সাঁতার

৩৯. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ, পৃঃ ৩।

৪০. মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ, ইসলাম ও আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা, আত-তাহরীক, (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা-১৯৯৮), পৃঃ ১২।

৪১. শিক্ষার সুফল ও কুফল, (আত-তাহরীক, ১৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা-নভেম্বর-২০০৯) পৃঃ-১৭।

৪২. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ, পৃঃ ৪।

কাটা, ব্যায়াম করা, গেঞ্জি-হাফপ্যান্ট পরে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা এহেন কর্মকাণ্ড নারীর সম্ভ্রমহানীর পথকে সুগম করে দিয়েছে। ফলে সমাজে নারী ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, অঙ্গহানী, এসিড নিক্ষেপ, উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদি জঘন্যকর্ম সংঘটিত হচ্ছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন তাদের সন্তানদের নিয়ে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি যেভাবে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, তাতে উদ্বিগ্ন সুশীল সমাজ। প্রযুক্তির প্রসার ও তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন মাধ্যমের কারণে তরুণ সমাজে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ও দোস্ত কালচার; এমনকি তা গড়িয়ে যাচ্ছে পরোকিয়ায়। পর্ণোগ্রাফির বিস্তার ও এর সংস্পর্শে আসার কারণে লজ্জা এবং নৈতিকতার বাঁধন ও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জাহীনতা, খোলামেলা ও অবাধ মেলামেশার অসুস্থ পরিবেশ। একসময় মা-বাবার উদ্বেগ ছিল ছেলে-মেয়েদের মোবাইলে কথা বলা এবং এসএমএস বিনিময় করা নিয়ে। কিন্তু এখন ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্কাইপ, ট্যাংগো, উইচ্যাট, হটসআপ ইত্যাদি ওয়েবক্যামের কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি অবারিত হয়েছে। পর্ণো প্রসারের ফলে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগজনক চিত্রের কথা জানিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষকেরা। শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াতের খবরও বের হচ্ছে।

কেস স্টাডি : গত ৭ সেপ্টেম্বর দৌলতদিয়া নিষিদ্ধ পল্লীতে খুন হয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ বছরের এক শিক্ষার্থী। রাজধানীর পুরান ঢাকায় পর্ণো ভিডিওতে অভিনয়ের সময় ধরা পড়েন দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। রাজধানীর এক কলেজের জনৈক ছাত্রের সাথে প্রণয়ে আশক্ত শিক্ষিকা। ইডেন কলেজের এক ছাত্রী পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ায় তার পিতা তাকে দেশের বাসা শেরপুর নিয়ে যায় এবং লেখা-পড়া বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু মেয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে। এছাড়া কয়েক দিন আগে পুরান ঢাকায় বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী খুন হওয়ার পর জানা যায়, নিহত ওই শিক্ষার্থী এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে বাসা ভাড়া নিয়ে লিভটুগেদার করতেন। নিহত ছাত্রীর মা-বাবা জানতেন তিনি কলেজের হোস্টেলে থাকেন। সহশিক্ষার কুফলের প্রতিফলন হিসাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাত ১০টা পর্যন্ত হলের বাহিরে থাকতে চায়। সেখানে জনৈক ছাত্রী বলে, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মুরগী নয় যে তারা শিয়ালের ভয়ে হলে ঢুকে পড়বে। আমরা অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়'। এমনকি ছাত্রীরা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তারা শ্লোগান দেয়, 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন; হল কোন খোয়াড় নয়, রাত ১০টার পর ঢুকতে হবে'। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ নভেম্বর ২০১৪ রাত ১২-টায় তিনজন ছাত্রী ও চারজন ছাত্র কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নেশায় আসক্ত হয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। সেই সময় প্রীতিলতা হলের এক ছাত্রী অজ্ঞান হলে তাকে ছেলেরা ধরে মেয়েটির হলে পৌঁছে দেয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি রাত ১০টার মধ্যে সকল গেট বন্ধ করা হবে। হায়রে শিক্ষানীতি! ধিক এই শিক্ষা ব্যবস্থার!

প্রতিকার :

(ক) পর্দার বিধান মেনে চলা : মহান আল্লাহ নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করার তাকীদ দেয়ার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের নির্লজ্জের মত চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে; জাহেলী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। যদি নারীদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহ'লে তাদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে হিজাব পরে বাইরে যাবে। এতে করে তাদেরকে কেউ উত্ত্যক্ত করার সাহস পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটি তাদের চেনার সহজ উপায়। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

(খ) পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা : প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শিক্ষার সকল স্তরে সহশিক্ষা বাতিল করে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা অথবা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফ্‌টে আলাদা শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠ দান করা। ফলে একদিকে পর্দার বিধান যথাযথ যেমন পালন করা হবে, অন্যদিকে শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু ও মার্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর সময় থেকেই পর্দার আড়ালে নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।[৪৩] আমেরিকা, রাশিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের হিসাব মতে, সহশিক্ষার কুফলের ভয়াবহতা বিবেচনা করে আমেরিকাতে ১৭০টি এবং রাশিয়াতে ১২০টি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্প্রতি মালেশিয়াতে যৌন হয়রানি থেকে রক্ষাকল্পে মহিলাদের জন্য পৃথক ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে।[৪৪] কর্মক্ষেত্রেও ছেলে ও মেয়েদের পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। এতে তারা মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।[৪৫]

(গ) সৎ বন্ধু গ্রহণ ও অসৎ বন্ধু ত্যাগ করা : একটি ভালো বন্ধু জীবনের অমূল্য সম্পদ। কোন ব্যক্তিকে জানতে ও বুঝতে চাইলে তার বন্ধুমহল কেমন তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সৎ বন্ধু দ্বারা সামান্যতম হ'লেও ভালো কিছু আশা করা যায়। এমনকি যদি তার অজান্তে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হয়। পক্ষান্তরে সে বন্ধু ব্যথিত হয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা করে, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু অসৎ বন্ধুর নিকট থেকে সামান্যতম হ'লেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভালো বন্ধু ও অসৎ বন্ধুর সঙ্গ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً. 'সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গের দৃষ্টান্ত হচ্ছে

৪৩. বুখারী, ফাৎহুল বারীসহ, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ) ১/২০৪ পৃঃ।
৪৪. হারুনুর রশীদ, ইভটিজিং: কারণ ও প্রতিকার, আত-তাহরীক, (১৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা-২০১০) পৃঃ ১৪।
৪৫. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস : কিছু পরামর্শ, পৃঃ ৬।

সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপারে ফুঁকদানকারীর মত। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দিবে অথবা ক্রয় করবে, অথবা সুঘ্রাণ গ্রহণ করবে। আর কামারের হাপারে ফুঁকদানকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবে নতুবা তার দুর্গন্ধ ও ছায় তো তুমি অর্জন করবেই'।[৪৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতম আসনের অধিকারী হবে ঐ সব লোক, যাদের চরিত্র সুন্দর'।[৪৭]

ইসলামী শিক্ষার সুফল :

সকল বিদ্যার্জন প্রকৃত ইলম অর্জন বলে না। যদিও জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা হ'তে হবে। সুশিক্ষা যেমন জাতিকে উন্নতি ও ইহকালীন-পরকালীন সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তেমনি অশিক্ষা-কুশিক্ষা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত করে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কথাটি অতীব সত্য, তবে সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একজন ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত হ'তে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও ইসলামী দর্শনে পারদর্শী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুশিক্ষিত বা স্ব-শিক্ষিত হ'তে পারবে না। প্রত্যেকটি সৃষ্টির যেমন মূল রয়েছে, তেমনি শিক্ষার মূল হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। কেননা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হ'ল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এ দু'টি বস্তুর বিদ্যার্জন ব্যতীত কোন শিক্ষিত পণ্ডিত বা উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তির মূল জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ।

বর্তমানে জাগতিক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান প্রতিদিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের মূল্যবোধ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ, যে হারে তথ্যভিত্তিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারে নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিধায় মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হচ্ছে। আর এজন্যই নৈতিকমান ভিত্তিক জ্ঞানার্জন আজ অতীব যরূরী। ইসলামী শিক্ষা মানুষের সুষম উন্নয়ন সাধন করে। ইংরেজ কবি John Milton বলেছেন, Education is the harmonious development of body, mind & soul. অর্থাৎ 'শিক্ষা হ'ল দেহ, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন'। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছু শর্ত পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দলে দলে গড়ে উঠেছে নৈতিকহীন, স্বার্থবাদী ডিগ্রিধারী কতিপয় পণ্ডিত। অথচ মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? উপদেশ গ্রহণ শুধু তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৩৯/৯)*।

ইসলামী জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'জ্ঞান যদি তোমার দেহের জন্য বৃদ্ধি হয়, তবে এ জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর স্বর্প। আর জ্ঞান যদি তোমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদিত হয়, তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু ও চরম গর্ব'। তিনি আরো বলেন, 'জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝি। জ্ঞান প্রদান করে শক্তি, আর এ শক্তি ধর্মের অধীনে হওয়া উচিত। কারণ তা যদি ধর্মের অধীনে না হয়, তবে তা হবে নির্ভেজাল পৈশাচিক'। ইসলামী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক Stanly Hall বলেছেন, `If you teach your children the three R's (Reading, Writing & Arithmetic) and leave the fourth R (Religion). You will get a fifth R (Rascality). অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের সন্তানের লেখা পড়া এবং মাত্র অংক শিক্ষা দাও কিন্তু ধর্মকে বাদ দাও, তাহ'লে তাদের কাছে তোমরা বর্বরতা পাবে'।

আদর্শ বর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সমাজে কি সর্বনাশ ডেকে এনেছে এ সম্পর্কে প্রফেসর হ্যারল্ড এইচ টিটাস বলেছেন, 'সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডারের অভাবের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে সাধারণ আদর্শ এবং প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি। শিক্ষা সত্যাপন, দৃঢ় বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা শিখাতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ এবং বাধ্যবাধকতা থেকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিপজ্জনক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।...শিক্ষা অতীতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তদস্থলে বিকল্প মূল্যবোধ প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে শিক্ষিত লোকেরাও আজ বিশ্বাস বঞ্চিত মূল্যবোধ বিবর্জিত এবং বঞ্চিত একটি সুসংহত বিশ্ব দর্শন থেকে'।[৪৮]

কতিপয় সুপারিশ :

(ক) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে আমরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। যেখানে দেশের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও ইসলামী মাযহাবী পাঠ্য বইসমূহ ঐচ্ছিক হিসাবে সিলেবাসভুক্ত হবে (খ) ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার পরিবেশ অথবা একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং পদ্ধতি চালু করে উভয়ের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যরূরী এবং (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ নিষিদ্ধ করা উচিত এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আশু যরূরী।[৪৯]

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, শিক্ষা গ্রহণে বিদ্যা অর্জিত হয়। কিন্তু বিদ্যা হিতকর ও অহিতকর দু'প্রকারেরই হ'তে পারে। অনেক প্রকারের বিদ্যা রয়েছে, কিন্তু সকল বিদ্যাই হিতকর বা উপকারী নয়। যে সকল বিদ্যা মানুষকে সরল পথে চলতে, নির্ভুল মত গ্রহণে ও সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম করে তা হিতকর এবং অবশ্যই তা যথার্থ। পক্ষান্তরে যে বিদ্যা মানুষকে চৌর্যবৃত্তি, দস্যুতা, প্রতারণা ইত্যাদি বিদ্যা হ'তে পারে, কিন্তু তা হিতকর নয় এবং সমর্থনযোগ্য বিদ্যা হতে পারে না। বরং তা মানব জীবন ও সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর। যে বিদ্যা দ্বারা চরিত্র গঠনের পরিবর্তে চরিত্রের স্খলন ঘটে তা অবশ্যই অহিতকর। আর বিদ্যার্জনের দ্বারা অবশ্যই চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধিত হ'তে হবে। যদি তা না ঘটে তাহ'লে বুঝতে হবে, শিক্ষা গ্রহণের সকল পদ্ধতি অকেজ ও বিফলে গেছে। অতএব আসুন! মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতঃ মানব সমাজে তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

৪৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৩৪।
৪৭. বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭৪।
৪৮. ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ, শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা, মাসিক আত-তাহরীক, (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-মে ২০০৩), পৃঃ ১২।
৪৯. দ্র. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রচারপত্র ও লিফলেট সমূহ।

লেক-পাহাড়ের রাঙ্গামাটি

ভ্রমণের পরিকল্পনা :

ডাক এসেছে পাহাড়ে যাবার। পাহাড়ে যাবার ডাক বহুবার এসেছে আমার জীবনে। আর পাহাড়ের ডাকে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেছি, এ কথা বলতে পারি না। গত ছয়-সাত বছর যাবৎ পাহাড়ের প্রতি দুর্নিবার টান ও ভালবাসায় ঘুরছি পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন যেলায়। পাহাড়ের ভাঁজ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের নান্দনিকতা, উপত্যকা অঞ্চলের মোহনীয় সৌন্দর্য দেখতে এবং ঝরনার শীতল পানিতে অবগাহনের জন্য কতবার যে গেলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে, তা হিসাব কষে বলা কঠিন। এবাবের ডাকটা আসল 'তানভীর ভাই'-এর কাছ থেকে, 'লেক-পাহাড়ের রাঙ্গামাটি' ভ্রমণের। মাগরিবের ছালাত আদায় করে ঢাকার মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমিন জামে মসজিদে বসেছিলাম। ইন্টারনেটে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তানভীর ভাই বললেন, 'বদরু ভাই! চলেন রাঙ্গামাটি যাই'। এমন প্রস্তাবে না বলার শক্তি যে আমার নেই, তানভীর ভাই তা ভালো করেই জানেন।

পরিকল্পনা মতো প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। রাঙ্গামাটি সফরের কথা শুনে 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহী'র ছাত্র ওবাইদুল্লাহ্‌র আর কিছুতেই তর সইল না। সর্বোপরি ভ্রমণ শুরুর কয়েক দিন আগেই ঢাকায় তার উপস্থিতি আমাদের অপেক্ষার প্রহরকে করে দিল আরো তীব্র ও রোমাঞ্চকর। গত বছর অক্টোবরে আমাদের সেন্টমার্টিন ভ্রমণে ওবাইদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ দু'জনেরই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন যেন যাওয়া হয়নি তাদের। এদিকে, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার আগে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক বান্দরবান ভ্রমণের জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু বছরের শুরুতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বান্দরবানে যাওয়া হয়নি। আবার ফেব্রুয়ারীতে সে চলে গেল সঊদী আরব, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যাত্রার প্রাক্কালের মুহূর্ত :

১৯ এপ্রিল, ২০১৫। রাত নয়টায় ঢাকার আসাদ গেট থেকে যখন ইউনিক পরিবহনে চেপে বসলাম, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম বেশ লম্বা করে। কয়েক দিন অন্তত ঢাকার কোলাহলপূর্ণ একঘেঁয়ে যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে হারিয়ে যাব সবুজের অরণ্য ও নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দিগন্ত প্রসারিত পাহাড় আর লেক-নদীর নীলাভ জলরাশির মাঝে। আল-হামদুলিল্লাহ।

সকালে পৌঁছলাম চট্টগ্রাম শহরের খলশীতে। ফজর ছালাতের জন্য যাত্রা বিরতি। পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে ছালাত আদায় করে পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলাম। চট্টগ্রাম থেকে আরও দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার পথ পেরুলে পাওয়া যাবে আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্য। ভ্রমণসঙ্গী মনোয়ার ভাই পূর্বে কখনো পাহাড়ী এলাকা বেড়াতে যাননি। আর তানভীর ভাইয়ের চাচাতো ভাই তানিম তো কিশোর। সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পিরোজপুর থেকে ঢাকায় বেড়াতে আসা তানিমের রাঙ্গামাটি ভ্রমণ একেবারে অন্য কিছু। অবশ্য ওবাইদুল্লাহ ও তানভীর ভাইয়ের পাহাড়ি এলাকা ভ্রমণের পূর্বাভিজ্ঞতা কিছুটা ছিল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ঢাকার মুহাম্মাদপুর আল-আমিন জামে মসজিদে ছালাত পড়তে আসার সুবাদে বিগত কয়েক বছর থেকে আমাদের একে অপরের মাঝে পরিচয়। মসজিদের দ্বীনী ভাইদের নিয়ে গড়ে উঠে আমাদের এই 'ভ্রমণ কাফেলা'।

যাহোক, রাউজান ছেড়ে পাহাড়ের মাঝে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম রাঙ্গামাটি শহরে। মানিকছড়ির পাহাড় পেরিয়ে ভেদভেদী থেকে রাঙ্গামাটি শহরের মাথার উপর দিয়ে বিস্তৃত কাপ্তাই হ্রদ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখের সামনে। অদ্ভুত সুন্দর সে দৃশ্য! দিগন্ত বিস্তৃত সারি সারি পাহাড়ের মেলা ও লেকের নীলাভ ও অতি স্বচ্ছ জলরাশির নয়নাভিরাম দৃশ্যে মনে হচ্ছিল স্বপ্নরাজ্যের কোন এক স্বপ্নপুরীতে অবগাহন করছি।

রাঙ্গামাটি : পাহাড়ী শহরের এদিক-সেদিক

উঠলাম আমরা 'নিড্স হিল ভিউ' নামক এক হোটেলে। বনরূপা বাজারের এ হোটেলে ইতিপূর্বে আমি কয়েকবার উঠেছি। রাঙ্গামাটি আসলে এ হোটেলেই আমার থাকা হয়। চেনা-জানা পরিবেশ। আমার ভ্রমণ পরিকল্পনায় বিশ্রামের অবকাশ সাধারণত থাকে না। তাই গোসল সেরে বেরিয়ে পড়তে দেরি হলো না। নাস্তা খেয়ে চলে গেলাম সোজা 'রাজবন বিহারে'। বিহারের পাশের জায়গাটিকে বানরের আখড়া বলা যায়। এখানে এলে বানরের বাহাদুরি দেখার সুযোগ আছে। গাছের ওপর, লেকের ধারে, জঙ্গলে যত্রতত্র বানরের দাপাদাপি। এ সব বানর সাধারণত কারো ওপর চড়াও হয় না। বিরক্ত না করে যে কেউ

নিরিবিলি দাঁড়িয়ে এদের দুষ্টুমি উপভোগ করতে পারেন। বিহারের ভিতরে ঢুকা থেকে বিরত থাকলাম আমরা। বিহার এলাকা ছেড়ে পাশের এলাকাটি দারুণ আকর্ষণীয়। কাপ্তাই হ্রদের ছোট ছোট খাল এখানে ঢুকে গেছে। কাঠের ব্রিজ দিয়ে পাশের পাড়াটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দলের সদস্যদের অনেকে এখানে এসেই বিমুগ্ধ। আর কিছু দেখার দরকার নেই এমনি ভাব! মনে হ'ল প্রথম দেখাতেই প্রাপ্তিহীন মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল!

ছোট্ট একটি নৌকায় খাল পার হয়ে গেলাম চাকমা রাজার বাড়ি পরিদর্শনে। বৈশাখ মাসে রোদের তেজ তীব্র হয়ে উঠল ক্রমেই। ছোট্ট একটি দ্বীপের ওপর রাজার বাড়ি। চাকমা রাজা এখানে থাকেন না। তবে তাঁর কার্যালয় আছে। সেখানে থাকেন পিয়ন-পেয়াদা, কর্মচারী-কর্মকর্তারা। ছোট বলা যাবে না রাজবাড়ির এলাকা। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, রাঙ্গামাটি শহরের কিছু অংশ পাহাড়ের ওপর ও পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বাকিটা কাপ্তাই হ্রদের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিস্তৃত এ শহরকে করেছে অনন্য। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী যোগাযোগের জন্য নৌকার ওপর নির্ভরশীল। অতঃপর বিভিন্ন প্রজাতির

Contents

গাছপালা বেষ্টিত রাজবাড়ি এলাকা ঘুরে ফিরে এলাম হোটেলে। তার আগেই আমরা যোহর ও আছরের ছালাত এবং খাওয়া-দাওয়ার কাজ শেষ করে ফেলেছি।

ঝুলন্ত ব্রীজের দোরগোড়ায় :

বিকেলে গেলাম পর্যটন এলাকায়। তবলছড়ির এ এলাকায় পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মত। এখানেই রাঙ্গামাটির বিখ্যাত 'ঝুলন্ত ব্রিজ'। তানিম ঝুলন্ত ব্রিজ যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আসলে রাঙ্গামাটি বলতে আমাদের দেশের মানুষ ঝুলন্ত ব্রিজকেই বুঝে থাকেন। কেননা এটি প্রতীকি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। পর্যটন এলাকার পুরো জায়গাটাই দৃষ্টিনন্দনীয়। দু'টো দ্বীপকে সংযুক্ত করেছে এই ঝুলন্ত ব্রিজ। এক দ্বীপে আছে পর্যটন কর্পোরেশন পরিচালিত হোটেল ও মোটেল এবং অপর দ্বীপে বিজিবি ক্যাম্প। পাশের দ্বীপে একটি চাকমা পাড়াও আছে। ঝুলন্ত ব্রিজে দাঁড়ালে প্রশস্ত কাপ্তাই হ্রদ আপনার দু'চোখে এনে দেবে বিস্ময়ের অসীম ধাঁধা। দূরের দিগন্তজোড়া সবুজ পাহাড় আর হ্রদের বিশালতায় মুগ্ধ হবেন না এমন কে আছেন! ছবি তোলার জন্য এখানে অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া গেল।

তানভীর ভাই স্ন্যাপ নিতে ভুল করলেন না। আমরাও থাকলাম তার পেছনে পেছনে। গোধূলির আলোয় সূর্যের ম্লান রশ্মি পানির ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন কিসের এক রূপ ধারণ করল। শান্ত ঢেউ এসে পড়তে থাকল দ্বীপের কুলে কুলে। ছোট ছোট নৌকায় দ্বীপবাসীর গমন-প্রতিগমন যেন ছবির দেশের কোনো এক বাস্তব গল্প। পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারপাশের এলাকা। সাঁজের আলোয় পাখিদের ডানা মেলে নীড়ে ফেরার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদেরও ফিরতে হ'ল ক্ষণিকের আবাস হোটেলে।

বরকলের কর্ণফুলি :

কথা মতো সকাল সাতটায় মাঝি আবু তাহের উপস্থিত হলেন শহরের সমতা বাজারে। ঘাটে পৌঁছাতে আমাদেরও দেরি হ'ল না। ফজরের ছালাত আদায় করে ঘুমের ওপর কার্ফিও জারি করা হ'ল। জুরাছড়ি আর বরকল উপযেলায় কোথায় কী আছে, এক দিনের এ ভ্রমণে ঘুরে দেখার মস্ত এক পরিকল্পনা কষেছি। সুতরাং সকাল সকাল না বেরুলে এ ভ্রমণ হয়তো পূর্ণতা পাবে না। রাঙ্গামাটি আসার আগেই নৌকা ঠিক করা ছিল। তবলছড়ির মাঝি জসিম ভাই আমাদের জন্য মাঝি আবু তাহেরকে ঠিক করলেন। দূরের বরকল ও জুরাছড়ি সাধারণত সব মাঝিরা যান না। আবু তাহেরের এ সব পথে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, জসিম ভাই আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

নৌকায় ওঠার আগে আমরা নাস্তা খাওয়ার কাজ সেরে ফেলেছি। কাঁঠাল বোঝায় বহু নৌকা দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। দূর-দূরান্ত থেকে নৌকা এসে ভিড় জমিয়েছে শহরের ঘাটে ঘাটে। রাঙ্গামাটির ঘাটগুলো এত সকালে ব্যস্ত হয়ে যায়, জানা ছিল না। এখানে রয়েছে বেশ কিছু প্রসিদ্ধ ঘাট। এর মধ্যে 'সমতা ঘাট' আমাদের হোটেলের কাছে হওয়ায় এখান থেকেই যাত্রা শুরু করলাম আমরা। রাঙ্গামাটি ভ্রমণ পরিকল্পনার প্রারম্ভে তানভীর ভাই বরকল উপযেলার ছোট হরিণা ঘুরার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আমার আগ্রহও কম ছিল না। ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি এ অঞ্চলের সৌন্দর্য না-কি অতুলনীয় ও মনোমুগ্ধকর। গুগল ম্যাপ নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করলাম বিস্তর। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চল আমার খুব বেশি আপন। বান্দরবানের অনেক দুর্গম স্পটে ঘুরার অভ্যাস আছে আমার। সুতরাং হরিণাও আমাকে দারুণভাবে টানতে লাগল। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটল অন্যখানে। রাঙ্গামাটির সাংবাদিক ছন্দসেন চাকমা এবং পরিচিত আরো অনেকের কাছে তথ্য নেওয়ার পর হরিণা ভ্রমণের আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থাকায় রাঙ্গামাটির কেউ-ই আমাদেরকে হরিণা যেতে উৎসাহিত করলেন না। অতএব জুরাছড়িকে মূল গন্তব্য ধরে বেরিয়ে পড়লাম মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে।

শহর ছেড়ে ইতিমধ্যে আমাদের নৌকা ঢুকে পড়েছে কাপ্তাইলেকের মূল অংশে। ফালা ফালা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সকালের আকাশে। পাহাড়ি এলাকায় অলস মেঘের অবিরাম ভেসে চলা দেখতে লাগে দারুণ! বর্ষাকালে রাঙ্গামাটির রূপ না দেখলে যেন কিছুই দেখা হ'ল না। বৈশাখেও এমন মেঘ সত্যিই আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত! আবার মৃদুমন্দ প্রাকৃতিক হাওয়ায় মনটাও দুলে দুলে উঠতে লাগল। যেন বাতাসের সাথে সাথে মেঘের ভাজে ভাজে দু'ডানা মেলে স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু সে সাধ তো মানুষের নেই। অতঃপর সামনে যতই এগোতে থাকলাম, ততই উদ্ভাসিত হচ্ছে রাঙ্গামাটি শহরের মাথার ওপর দিয়ে 'ফুরামন পাহাড়'। সে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। দূর থেকে মনে হ'ল বিচ্ছিন্ন মেঘ যেন ফুরামনের গলা ধরে আছে অবিচ্ছিন্নভাবে। বর্ষাকালে ফুরামনের সঙ্গে মেঘের থাকে ভীষণ সখ্যতা। গত বছর বর্ষায় ফুরামনের সঙ্গে মেঘের দহরম মহরম খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

যাই হোক, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা বরকল উপযেলার সীমান্তে পৌঁছে গেলাম। বড় করে লেখা আছে, 'স্বাগতম বরকল উপযেলা'। প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেবার জন্য নৌকা থামাতে হ'ল এখানে। ভালোই হ'ল নোঙ্গর করে। এখানে না নামলে

Contents

পাহাড়ের ওপর উঠে কর্ণফুলির মোচড় খাওয়া বাঁকটা হয়তো দেখা হ'ত না। বরকলের শুরুতে কর্ণফুলির দুই ধারে কাটা পাহাড় দেখে রীতিমত অবাক হওয়ার কাণ্ড। হাযার বছর ধরে চেষ্টা করেও মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না এমন করে পাহাড় কাটার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশাল এই পৃথিবীতে কত বিস্ময়করভাবেই না সৃষ্টি করেছেন! রাঙ্গামাটির মানচিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকলে এই এলাকা ভ্রমণের সময় মনে হবে কাপ্তাই লেকের বৃহৎ দুই অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটানোর জন্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পাহাড়ের রেঞ্জ কেটে এক নদীর প্রবাহিত ধারা। দৃষ্টি ফিরতে চাইল না নদীর দু'পাশের মোহনীয় রূপ থেকে। এ নদী অনেক ব্যস্ত। ট্রলার ও নৌকার চলছে ছুটোছুটি খেলা। বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল ও জুরাছড়ি উপযেলার অধিবাসীদের জুমের ফলমূল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করার জন্য আসতে হয় রাঙ্গামাটি শহরে কর্ণফুলি নদীর এই পথ ধরে। পাহাড়িরা এ পথে যাতায়াতের সময় বেশ আনন্দ করেন বুঝতে পারলাম। যদিও তা দেখে আমরাও কম আনন্দ পেলাম না।

শুভলং ঝরনার পাদদেশে :

অতঃপর আমাদের নৌকা থামল রাঙ্গামাটির বিখ্যাত ঝরনা 'শুভলং'-এর সামনে। শুভলং ঝরনা না দেখে সামনে যেতে চাইলেন না আমাদের অনেকে। শুকনো মৌসুমে শুভলং ঝরনা বেশ কৃপণ। বস্তুতঃ ঝরনা দেখার জন্য উত্তম কাল হ'ল বর্ষা ঋতু। এ সময় ঝরনা থাকে চঞ্চল-চপলা ও উদার। অনেক ওপর থেকে পানির ধারা নেমে আসে শুভলং ঝরনায়। তবে শুকনো মৌসুম হলেও অল্প অল্প পানি পড়তে দেখে তানিম কম খুশি হ'ল না। জীবনে এই প্রথম সে কোনো ঝরনার চেহারা দেখল। পাথুরে পাহাড়ের এ ঝরনার চারপাশের পরিবেশ দারুণ ঠাণ্ডা ও শান্ত। রাঙ্গামাটিতে আসা সিংহভাগ পর্যটকের প্রধান গন্তব্য থাকে শুভলং ঝরনা। শীত ও বর্ষাকালে এখানে থাকে পর্যটকের ব্যাপক আনাগোনা। ঝরনার ঘাটে ফিরে ছোট্ট একটি নৌকা দেখে ওবাইদুল্লাহ ও তানিম লোভ সামলাতে পারল না। দু'জনে মিলে কিছুক্ষণ হেঁইও হেঁইও করল। এর অল্প পরেই দেখতে পেলাম প্রশস্থ কাপ্তাই হ্রদের আরেক অংশ। কর্ণফুলির মোহনীয় সৌন্দর্য ছাড়তে না ছাড়তেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট্ট এক দ্বীপ। আর দূরে পাহাড়ের সারি। এ দ্বীপের ওপর শুভলং বাজার।

শুভলং বাজারে নেমে ঢুকলাম একটা খাবার হোটেলে। নাস্তা সেরে বাজার ঘুরে দেখার ফাঁকে এক দোকানে চোখে পড়ল কলার এক মস্ত কাঁদি। ছোঁ মেরে ওবাইদুল্লাহ কলার কাঁদিটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। পাহাড়ি এলাকায় এসে কলা-পেঁপে খাব না তা হয় কী করে, এমনি ভাব তার। আসলে ফল খাওয়ার জন্য পাহাড়ি এলাকা এখনো নিরাপদ। তাছাড়া পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণে এলে পেঁপে-কলার প্রতি বরাবরই অসম্ভব ঝোঁক থাকে আমার।

শুভলং একটা ট্রানজিট পয়েন্ট। বিভিন্ন রুটে গমনকারী নৌকা ও ট্রলারের মাঝিরা শুভলং সেনাক্যাম্পে নাম এন্ট্রি না করে যেতে পারেন না। শুভলং দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে কাসালং নদী ধরে যেতে হয় বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপযেলা। এ পথেই আছে কাপ্তাই লেকের বিস্তৃত অংশ। আর পূর্ব দিকে বরকল হয়ে হরিণা। হরিণা দিয়েই কর্ণফুলি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জুরাছড়ির অবস্থান শুভলং থেকে দক্ষিণ দিকে। রাঙ্গামাটির দুই সুপরিচিত নদী কাসালং ও কর্ণফুলির মিলন স্থলও এই শুভলং।

শুভলং সেনাক্যাম্পের ক্যান্টিনে আমাদের অপেক্ষা চলছে মিষ্টি খাওয়ার। হরিণায় বানানো দারুণ স্বাদের মিষ্টি পাওয়া যায় এখানে। চারটা করে মিষ্টি খেতে কারো কষ্ট হ'ল না। অথচ আমি নিজে দুই পিচের বেশি মিষ্টি খেয়েছি, এমন নযীর খুব কমই আছে। মিষ্টি খাওয়ার ফাঁকে সেনা সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন গল্প জমে উঠল। কথাবার্তায় যা বুঝতে পারলাম এখানকার সেনা সদস্যরা বেশ আন্তরিক। বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে যাত্রা বিরতি লম্বা করতে সাহস পেলাম না।

জুরাছড়ি : মায়াবী উপত্যকার হাতছানি

নৌকা চলতে লাগল আবার ভটভট শব্দ করে। সামনে দিগন্ত জুড়ে পাহাড়ের সারি। কাপ্তাই হ্রদের স্বচ্ছ পানির ওপর যেন আমরা কয়জন ভাসতে লাগলাম। জুরাছড়ি কতদূর জানি না। মাঝি আবু তাহের মুখে হাসি মেলে জানালেন, দেড় থেকে দুই ঘণ্টা লাগতে পারে। ইতিমধ্যে নৌকার ছাদটা আমাদের সবার প্রিয় জায়গা হয়ে গেছে। পাঁচ জনের কাফেলায় এ নৌকাটা বেশ বড়। ছাদে শুয়ে-বসে আমাদের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। রোদের তেজ অনুভূত হচ্ছে না তেমন। কৌতূহলী মন জুরাছড়ির ছবি এঁকে চলেছে সারাক্ষণ। শুভলং পার হয়ে এ পথে আসা যে আমার প্রথম। নতুন যে কোনো জায়গা নিয়ে থাকে আমার দারুণ কৌতূহল। আর পাহাড়ি এলাকা হলে তো ভিন্ন কথা।

শুষ্ক মৌসুমে কাপ্তাই লেক অনেক জায়গায় তার যৌবন হারিয়ে ফেলে। ক্রমেই হ্রদের প্রশস্থতা কমে আসল। আর লেকের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের সংখ্যা বাড়তে থাকল। ছোট-বড় বহু খাল পাহাড় বেয়ে মিশেছে কাপ্তাই হ্রদে। মাঝি কয়েকবার পথ ভুল করলেন। কোথায় যাচ্ছি, কোন্ পথের যাত্রী ভুলতে বসেছি আমরা। এটা কি বাংলাদেশ না-কি অন্য কোনো ভূমে আমাদের পদচারণা, চিন্তা করতে গিয়ে সেখানেও ভ্রম হতে লাগল। দুই পাহাড়ের মাঝে বিস্তৃত উপত্যকাঞ্চল। সেই উপত্যকার শুকনো হ্রদ, নদী ও খালে চলছে জেলেদের মাছ ধরা। ছোট ডিঙ্গি নৌকায় করে আদিবাসী নারীদের মাছ ধরার কাজ আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। এখানে পাখিদের হন্যে হয়ে খাবার তালাশ করার দৃশ্যও কম আকর্ষণের বিষয় ছিল না। নদীর পাশে আদিবাসীদের জীবন, সবুজ ধানক্ষেত, দ্বীপের ওপর পাহাড়িদের নিপুণ হাতে বানানো মাটির বাড়ি সহ কোনো কিছুই দৃষ্টি এড়াল না। সত্যি অনিন্দসুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেখানে।

বেলা একটার সময় পৌঁছলাম জুরাছড়ির রাস্তার মাথা নামক ঘাটে। এখান থেকে জুরাছড়ি সদর আরো কিছুটা দূরে। বর্ষাকালে নৌকা চেপেই যাওয়া যায় সদর পর্যন্ত। কিন্তু এখন শুষ্ক মৌসুম বলে নৌকা আর সামনে যেতে পারল না। এখান থেকে যাতায়াতের মাধ্যম টেম্পু। রাঙ্গামাটির এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে, আমার ধারণাতেই ছিল না। পাঁচ কিলোমিটারের এ পথ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বানানো। রাস্তার পাশে বিশাল এক উপত্যকাঞ্চল। সবুজ গালিচা সদৃশ আর সৌন্দর্যের কোমলতা এখানে মিশে যেন একাকার। ছোট-বড় নালা এঁকেবেঁকে বিস্তৃত ধান খেতের বিশাল এ প্রান্তরকে ভেদ করে চলেছে। বর্ষাকালে পুরো উপত্যকাঞ্চলটি থাকে সাগরের মত অথৈ জলে ভরপুর।

পাহাড়ের কোলে জুরাছড়ির অবস্থান। চাকমারা এখানকার প্রধান অধিবাসী। কিছু সেটেলার বাঙ্গালীর বসবাসও আছে এখানে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে বাঙ্গালী বসতির হার বেশ কম। নারিকেল গাছ ঘেরা এখানকার অনেক মাটির বাড়ি দেখতে

দারুণ। স্কুল ফেরত আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের অনেকে আমাদের দেখে অপলক চেয়ে থাকল যেন এই প্রথম তারা কোনো বহিরাগতদের দেখল। এখানে পর্যটক কম আসেন। হয়তো আমাদের অনেকের কেতাদুরস্ত ভাব, ঘাড়ে ক্যামেরা ইত্যাদি তাদেরকে আকর্ষণ করে থাকতে পারে। ছোট্ট একটা পুকুরের পাশে বহু নারিকেল গাছ দেখে ওবাইদুল্লাহ আর মনোয়ার ভাই ডাব খাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। মালিকের সঙ্গে কথা বলে তারা দু'জনে দা-বটি নিয়ে চটজলদি হাযির। এবার গাছে ওঠা নিয়ে বাধল বিপত্তি। চাকমা এক যুবক একশ' টাকা না দিলে গাছে উঠবে না। এমনই গোঁ ধরে বসল। পাঁচ জনের পাঁচটি ডাব খেতে লাগবে একশ' টাকা, আর ডাব পাড়ার খরচ দিতে হবে সমপরিমাণ টাকা; এ আবার কোন্ মল্লকরে ভাই! পাহাড়ি এলাকার ডাবে যে স্বাদ পেলাম, টাকা নিয়ে পরে অবশ্য পস্তাতে হ'ল না। যাই হোক, অনেকে যোহরের ছালাত জুরাছড়ির মসজিদে আদায় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এখানে একটি মসজিদ আছে। কিন্তু আমরা আর দেরি করতে চাইলাম না। ফিরে যেতে হবে যে বহু দূর।

বর্ষাকালে দূর থেকে জুরাছড়ি দেখতে অনেকটা ছবির মত সুন্দর। পাহাড় ঘেরা উপত্যকাগুলের জুরাছড়ি যেন পাহাড় কোলের কোনো এক মায়াপুরী। ফিরে আসলাম ঘাটে। দুপুরে খাওয়ার খিদে নেই। খিদে থাকবেই বা কেমন করে। শুভলং থেকে সারাটা পথ কলার কাঁদি মুখের সামনে। কলা নামক বস্তুটা যেন কেবল পার্বত্যাঞ্চলেই পাওয়া যায়। অতএব যত পারো খাও কলা, অন্য কিছু দরকার নেই বলা, এমনই আমাদের ভাবসাব খানা। এরপরও ঘাটের বাজারে পাহাড়ি আঁখ দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না কেউ-ই। আঁখ চিবাতে চিবাতে উঠে পড়লাম অপেক্ষমাণ নৌকায়। জুরাছড়ি থেকে বেলা তিনটায় শুরু হ'ল আমাদের ফেরার পালা।

ভিজা কিসিম সেনা ক্যাম্পে এসে নৌকা থামল। কী একটা কারণে মাঝির ছাড়পত্র নিতে দেরি হয়ে গেল। জুরাছড়ির এ পথে যাতায়াতের সময় প্রত্যেক মাঝির জন্য ভিজা কিসিম ক্যাম্পের ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। সে ফাঁকে আমাদের ধৈর্য আর বাঁধ মানল না। নেমে পড়লাম কাপ্তাই লেকের নীলাভ জলরাশির বুকে। শুরু হয়ে গেল দাপাদাপি। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল তানভীর ভাইয়ের দৌড় কোমর পানি পর্যন্ত। সাঁতার না জানা তানভীর ভাইয়ের জন্য এ এক অস্বাভাবিক ঘটনা এবং আমাদের জন্য বেশ আনন্দের খোরাক জমিয়েছিল। বরিশালের ছেলেরা সাঁতার জানবে না, এ আবার হয় নাকি! নদী-মাতৃক দেশ বলতে তো বুঝায় বরিশাল বিভাগকে। কাপ্তাই লেক আর কর্ণফুলিতে দাপাদাপি করার পরিকল্পনা ছিল জোরালো। সুতরাং প্রস্তুতিও ছিল বেশ। কেউ থ্রি-কোয়ার্টার, কেউ আবার লুঙ্গি পরেই নেমে পড়লাম সাঁতার দিতে। আমাদের দাপাদাপির ছবিও কম তুলতে ছাড়লেন না তানভীর ভাই।

ছাড়পত্র নেওয়ার পর নৌকা আবার চলতে লাগল সামনের দিকে। কিছুক্ষণ আসার পর চোখে পড়ল একটা পাহাড়ের রেঞ্জ। রাঙ্গামাটি সদরের বালুখালী ইউয়িনের পাহাড় এটি। আর নদীর ওপারে শুভলং ইউনিয়নের পাহাড় সারি। বালুখালীর পাহাড়ের পাদদেশে একটা ঘর দূর থেকে চোখে পড়ল। তার পাশেই জ্বলছে জুমের আগুন। পাহাড়ে উৎপাদিত ফসলকে বলা হয় জুম। জুমচাষ শুরু হয় সাধারণত মে-জুন মাসে। তার আগেই পাহাড়ের জঙ্গল কেটে শুকাতে হয় গাছপালা। এর পর আগুন দিয়ে সেগুলো পুড়াতে হয়। ইতিমধ্যে আমরা এখানে নেমে শুরু করে দিয়েছি আবার দাপাদাপি। আসলে গোসলের খিদেটা যেন মিটছেই না কোনোভাবে। এমন স্বচ্ছ পানিতে সারাক্ষণ গলা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলেই যেন স্বস্তি পাই পরতে পরতে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

[লেখক : মুহাম্মাদ বদরুযযামান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি
ও প্রতিষ্ঠাতা, ডেল্টা ট্যুরিজম বাংলাদেশ]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

ফরাসী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রীধারী খাওলা নাকাতার ইসলাম গ্রহণ

খাওলা নাকাতা একজন জাপানী নাগরিক। ফরাসী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। ফ্রান্সে অবস্থানকালে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালের দিকে রিয়াদস্থ জাপানী দূতাবাসে কর্মরত তাঁর স্বামীর সাথে রিয়াদে আগমন করেন। ২৫/১০/১৯৯৩ তারিখে তিনি সঊদী আরবের আল-কাসিম প্রদেশের কেন্দ্র 'বুরাইদা' শহরের ইসলামী কেন্দ্রের মহিলা বিভাগে 'ইসলাম ও পর্দা' সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ইংরেজি ভাষায় একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনান এবং উপস্থিত বোনদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। ফরাসী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রীধারী জাপানী নাগরিক খাওলা নাকাতার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ও হিজাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা শুনুন তার নিজের কণ্ঠেই-

খাওলা নাকাতা বলেন, ফ্রান্সে অবস্থানকালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ জাপানীর ন্যায় আমিও কোন ধর্মের অনুসারী ছিলাম না। ফ্রান্সে আমি ফরাসী সাহিত্যের উপরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লেখাপড়ার জন্য এসেছিলাম। আমার প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ ছিলেন সাঁর্তে, নিৎশে ও কামাস। এদের সকলের চিন্তাধারা ছিল নাস্তিকতাভিত্তিক।

ধর্মহীন ও নাস্তিকতা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার আভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজনে নয়, শুধুমাত্র জানার আগ্রহই আমাকে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। মৃত্যুর পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা ছিল না; বরং কিভাবে জীবন কাটাব এটাই ছিল আমার আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার সময় নষ্ট করে চলেছি, যা করার তা কিছুই করছি না। ঈশ্বরের বা স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা আমার কাছে সমান ছিল। আমি শুধু সত্যকে জানতে চাইছিলাম। যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে তাঁর সাথে জীবন যাপন করব, আর যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে না পাই তাহ'লে নাস্তিকতার জীবন বেছে নেব এটাই আমার উদ্দেশ্য।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি পড়াশুনা করতে থাকি। ইসলাম ধর্মকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। আমি কখনো চিন্তা করিনি যে, এটা পড়াশোনার যোগ্য কোন ধর্ম। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইসলাম ধর্ম হ'ল মূর্খ ও সাধারণ মানুষদের একধরণের মূর্তিপূজার ধর্ম। কত অজ্ঞই না আমি ছিলাম!

আমি কিছু খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। তাদের সাথে আমি বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। বেশ কিছুদিন গত হবার পর আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি এক নতুন সমস্যার মধ্যে পড়লাম। আমি কিছুতেই আমার অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিলাম না, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চেষ্টা বৃথা হ'ল। তখন আমি স্রষ্টার অনুপস্থিতি খুব প্রবলভাবে অনুভব করতে লাগলাম।

তখন আমি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। আশা করছিলাম এ ধর্মের অনুশাসন পালনের এবং যোগাভাসের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব। খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আমি অনেক কিছু পেলাম, যা সত্য ও সঠিক বলে মনে হ'ল। কিন্তু অনেক বিষয় আমি বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, ঈশ্বর বা স্রষ্টা যদি থাকেন তাহ'লে তিনি হবেন সকল মানুষের জন্য এবং সত্য ধর্ম অবশ্যই সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য হবে। আমি বুঝতে পারলাম না, ঈশ্বরকে পেতে হ'লে কেন মানুষকে স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কোন সমাধানে আসতে পারল না। এমতাবস্থায় আমি একজন আলজেরীয় মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হ'লাম। তিনি ফ্রান্সেই জন্মেছেন, সেখানেই বড় হয়েছেন। তিনি ছালাত আদায় করতে জানতেন না। তার জীবনযাত্রা ছিল একজন সত্যিকার মুসলিমের জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি তার বিশ্বাস ছিল খুবই দৃঢ়। তার জ্ঞানহীন বিশ্বাস আমাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলে। তাই আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুরুতেই আমি পবিত্র কুরআনের এক কপি ফরাসী অনুবাদ কিনে আনি। কিন্তু আমি ২ পৃষ্ঠাও পড়তে পারলাম না, কারণ আমার কাছে তা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

আমি একা একা ইসলাম বোঝার চেষ্টা ছেড়েদিলাম এবং প্যারিস মসজিদে গেলাম। আশা করছিলাম সেখানে কাউকে পাব, যিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সেদিন ছিল রবিবার এবং মসজিদে মহিলাদের একটি আলোচনা চলছিল। উপস্থিত বোনেরা আমাকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমার জীবনে এই প্রথম আমি ধর্মপালকারী একজন মুসলিমদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, নিজেকে তাঁদের মধ্যে অনেক সহজ ও আপন বলে অনুভব করতে লাগলাম; অথচ খৃষ্টান বান্ধবীদের মধ্যে সর্বদায় নিজেকে আগন্তুক ও দূরাগত অতিথি বলে অনুভব করতাম।

প্রত্যেক রবিবারে আমি আলোচনায় উপস্থিত হ'তে লাগলাম। সাথে সাথে মুসলিম বোনদের দেওয়া বইপত্র পড়তে লাগলাম। এসকল আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত এবং বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত মনে হ'তে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল, সেজদারত অবস্থায় আমি স্রষ্টাকে আমার অত্যন্ত কাছে অনুভব করতাম।

আমার পর্দা :

দু'বছর আগে (১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে), যখন ফ্রান্সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি, তখন মুসলিম স্কুলছাত্রীদের ওড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা নিয়ে ফরাসীদের বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। অধিকাংশ ফরাসী নাগরিকের ধারণা ছিল, ছাত্রীদের মাথা ঢাকার অনুমতিদান সরকারী স্কুলগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার নীতির বিরোধী। আমি তখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে আমার বুঝতে খুব কষ্ট হ'ত, মুসলিম ছাত্রীদের মাথায় ওড়না বা স্কার্ফ রাখার মত সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ফরাসীরা এত অস্থির কেন? দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছিল যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, বৃহৎ শহরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আরব দেশগুলো থেকে আসা বহিরাগতদের ব্যাপারে উত্তেজিত ও স্নায়ুপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শহরগুলোতে ও স্কুলগুলোতে ইসলামী পোশাক দেখতে আগ্রহী ছিলেন না।

অপরদিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে ইসলামী হিজাব বা পর্দার দিকে ফিরে আসার জোয়ার এসেছে। অনেক আরব বা মুসলিম এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্য জনগণের কাছে এটা ছিল কল্পনাতীত; কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে পর্দা প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে।

ইসলামী পোশাক ও পর্দা ব্যবহারের আগ্রহ ইসলামী পুনর্জাগরণের একটা অংশ। এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট, অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে সে গৌরব বিনষ্ট ও পদদলিত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

জাপানী জনগণের দৃষ্টিতে মুসলিমদের পুরোপুরি ইসলাম পালন একধরণের পাশ্চাত্য বিরোধিতা ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা, যা মেজি যুগে জাপানীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তখন তারা প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও পোশাক পরিচ্ছদের বিরোধিতা করে।

মানুষ সাধারণত ভালমন্দ বিবেচনা না করেই যেকোন নতুন বা অপরিচিত বিষয়ের বিরোধিতা করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজাব বা পর্দা হচ্ছে মেয়েদের নিপীড়নের একটি প্রতীক। তারা মনে করেন, যে সকল মহিলা পর্দা মেনে চলে বা চলতে আগ্রহী তারা মূলতঃ প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করেন। তাদের বিশ্বাস, এ সকল মহিলাকে যদি তাদের ন্যক্কারজনক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীন চিন্তার আহ্বান সঞ্চারিত করা যায়, তাহ'লে তারা পর্দাপ্রথা পরিত্যাগ করবে।

এধরণের উদ্ভট ও বাজে চিন্তা শুধু তারাই করেন, যাদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা তাদের মনমগজ এমনভাবে অধিকার করে নিয়েছে যে, তারা ইসলামের সার্বজনীনতা বুঝতে একেবারেই অক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের সর্বত্র অগণিত অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছেন, যাদের মধ্যে আমিও একজন। এদ্বারা আমরা ইসলামের সার্বজনীনতা বুঝতে পারি।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী হিজাব বা পর্দা অমুসলিমদের জন্য একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। পর্দা শুধু নারীর মাথার চুলই ঢেকে রাখে না, উপরন্তু আরো এমন কিছু আবৃত করে রাখে, যেখানে অন্যদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। আর এজন্যই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করেন। বস্তুতঃ পর্দার অভ্যন্তরে কি আছে বাইরে থেকে তারা তা মোটেও জানতে পারেন না।

প্যারিসে অবস্থানকালেই ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি হিজাব বা পর্দা মেনে চলতাম। আমি একটা স্কার্ফ দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিতাম। পোশাকের সংগে মিলিয়ে একই রঙের স্কার্ফ ব্যবহার করতাম। হয়ত অনেকে এটাকে নতুন একটা ফ্যাশন ভাবত। সঊদী আরবে অবস্থানকালে আমি কাল বোরকায় আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখতাম, এমনকি আমার মুখমণ্ডল এবং চোখও।

যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে পারব কি-না, অথবা পর্দা করতে পারব কি-না তা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। আসলে আমি নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাইনি; কারণ আমার ভয় হত, হয়ত উত্তর হবে না সূচক এবং তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হতে পারে। প্যারিসের মসজিদে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন এক জগতে বাস করেছি, যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। ছালাত, পর্দা কিছুই আমি চিনতাম না। আমার জন্য একথা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল যে, আমি ছালাত আদায় করছি বা পর্দা পালন করে চলছি। তবে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা আমার এত গভীর ও প্রবল ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। বস্তুতঃ আমার ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহ্‌র অলৌকিক দান ও রহমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আল্লাহ আকবার!

ইসলামী পোশাক বা হিজাবে আমি নিজেকে নতুন ব্যক্তিত্ব অনুভব করলাম। আমি অনুভব করলাম যে, আমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়েছি, আমি সংরক্ষিত হয়েছি। আমি আরো অনুভব করতে লাগলাম যে, আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আলহামদুল্লিাহ।

একজন বিদেশিনী হিসাবে অনেক সময় আমি লোকের দৃষ্টির সামনে বিব্রতবোধ করতাম। হিজাব ব্যবহারে এ অবস্থা কেটে যায় এবং পর্দা আমাকে এ ধরনের অভদ্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

পর্দার মধ্যে আমি আনন্দ ও গৌরববোধ করতে লাগলাম। কারণ পর্দা শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি আমার আনুগত্যের প্রতীকই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম নারীদের মাঝে আন্তরিকতার বাঁধন। পর্দার মাধ্যমে আমরা ইসলাম পালনকারী মহিলারা একে অপরকে চিনতে পারি এবং আন্তরিকতা অনুভব করি। সর্বোপরি পর্দা আমার চারপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ্‌র কথা। আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। পর্দা আমাকে বলে দেয়, 'সতর্ক হও! একজন মুসলিম নারীর যোগ্য কর্ম কর'।

একজন পুলিশ যেমন ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন, তেমনি পর্দার মধ্যে আমি একজন মুসলিম হিসাবে নিজেকে বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম। আমি যখনই মসজিদে যেতাম তখনই হিজাব ব্যবহার করতাম। এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার, কেউই আমাকে পর্দা করতে চাপ দেয়নি।

ইসলাম গ্রহণের দুই সপ্তাহ পর আমি আমার এক বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাপানে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, ফ্রান্সে আর ফিরে যাব না। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। উপরন্তু আরবী ভাষা শেখার প্রতি আমি আগ্রহ বেশী হ'তে থাকে।

মুসলিম পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একাকী জাপানের একটি ছোট্ট শহরে বসবাস করা আমার জন্য একটা বড় ধরণের পরীক্ষা ছিল। তবে এ একাকিত্ব আমার মধ্যে মুসলমানিত্বের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর করে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য শরীর দেখানো পোশাক পরা নিষিদ্ধ। কাজেই আমার আাগের মিনি-স্কার্ট, হাফহাতা ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক পোশাকই আমাকে পরিত্যাগ করতে হ'ল। এছাড়া পাশ্চাত্য ফ্যাশন ইসলামী হিজাব বা পর্দার পরিপন্থী। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নিজের পোশাক নিজেই তৈরি করে নেব। আমার এক পোশাক তৈরিতে অভিজ্ঞ বান্ধবীর সহযোগিতায় আমি দু'সপ্তাহের মধ্যে আমার জন্য পোশাক তৈরি করে ফেললাম। পোশাকটি ছিল অনেকটা পাকিস্তানী সেলোয়ার-কামিজের মত। আমার এই অদ্ভুত পোশাক দেখে কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি।

জাপানে ফেরার পর ছয়মাস এভাবে কেটে গেল। কোন মুসলিম দেশে গিয়ে আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার মধ্যে খুবই প্রবল হয়ে উঠল। এ আগ্রহ বাস্তাবায়িত করতে সচেষ্ট হ'লাম। অবশেষে মিশরের রাজধানী কায়রোতে পাড়ি জমালাম।

কায়রোতে মাত্র এক ব্যক্তিকেই আমি চিনতাম। আমার এই মেযবানের পরিবারের কেউই ইংরেজি জানত না। ফলে আমি আশাহত হয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়লাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল, যে মহিলা আমাকে হাত ধরে বাসার ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি বোরকায় তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত সহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। এ ফ্যাশান (বোরকা)

এখন আমার অতি পরিচিত এবং রিয়াদে অবস্থানকালে আমি নিজেও এই পোশাক ব্যবহার করি। কিন্তু কায়রোতে পৌঁছেই এটা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই।

ফ্রান্সে থাকতে একদিন আমি মুসলিমদের একটা বড় ধরণের কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি সর্বপ্রথম এ ধরণের মুখঢাকা কালো পোশাক দেখতে পাই। রং বেরঙের স্কার্ফ ও পোশাক পরা মেয়েদের মাঝে তাঁর পোশাক খুবই বেমানান লাগছিল। আমি ভাবছিলাম, এ মহিলা মূলতঃ আরব ট্রাডিশন ও আচরণের অন্ধ অনুকরণের ফলেই এ রকম পোশাক পরেছেন, ইসলামের সঠিক শিক্ষা তিনি জানতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তখনো আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, মুখ ঢেকে রাখা একটা আরবীয় অভ্যাস ও আচরণ, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কায়রোর ঐ মহিলাকে দেখেও আমার অনেকটা অনুরূপ চিন্তাই মনে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, পুরুষদের সাথে সকল প্রকার সংযোগ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা এই মহিলার মধ্যে রয়েছে তা অস্বাভাবিক।

কালো পোশাক পরা এক বোন আমাকে জানালেন যে, আমার নিজের তৈরি পোশাক বাইরে বেরোনোর উপযোগী নয়। আমি তার কথা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলিম মহিলার পোশাকের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা সবই আমার ঐ পোশাকে ছিল।

তবুও আমি ঐ মিশরীয় বোনের মত ম্যাক্সি ধরণের কাল রঙের বড় একটা কাপড় কিনলাম, যা গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে। উপরন্তু একটি কাল খিমার অর্থাৎ বড় ধরনের শরীর জড়ানো চাদরের মত ওড়না কিনলাম, যা দিয়ে আমার শরীরের উপরিভাগ, মাথা ও দু'বাহু আবৃত করে নিতাম। আমি আমার মুখ ঢাকতেও রাযী ছিলাম, কারণ দেখলাম তাতে বাইরের রাস্তার ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বোনটি জানালেন, মুখ ঢাকার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু ধুলা থেকে বাঁচার জন্য মুখ ঢাকা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে মুখ ঢেকে রাখতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

মুখ ঢেকে রাখা যে সকল বোনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, কায়রোতে তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কায়রোর অনেক মানুষ কাল খিমার বা ওড়না দেখলেই বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে উঠতেন। পাশ্চাত্য ধাঁচে জীবন-যাপনকারী সাধারণ মিশরীয় যুবকেরা এ সকল খিমারে ঢাকা পর্দানশীন মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এদেরকে তাঁরা 'ভগ্নীগণ' বলে সম্বোধন করতেন। রাস্তাঘাটে বা বাসে উঠলে সাধারণ মানুষেরা এদেরকে বিশেষ সম্মান করতেন ও ভদ্রতা দেখাতেন। এসকল মহিলা রাস্তাঘাটে একে অপরকে দেখলে আন্তরিকতার সাথে সালাম বিনিময় করতেন, তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমি স্কার্টের চেয়ে প্যান্ট বেশি পসন্দ করতাম। কিন্তু কায়রো এসে লম্বা ঢিলেঢালা কালো পোশাক পরতে শুরু করি। শীঘ্রই আমি এই পোশাককে পসন্দ করে ফেলি। এ পোশাক পরে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত মনে হ'ত। মনে হ'ত আমি একজন রাজকন্যা। তাছাড়া এ পোশাকে আমি বেশ আরামবোধ করতাম, যা প্যান্ট পরে কখনো অনুভব করিনি।

খিমার বা ওড়না পরা বোনদেরকে সত্যিই অপূর্ব সন্দর দেখাতো। তাদের চেহারায় এক ধরণের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটে উঠত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম নারী বা পুরুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি ঐ সকল মানুষের মানুসিকতা মোটেও বুঝতে পারি না, যাঁরা ক্যাথলিক সিস্টারদের ঘোমটা দেখলে কিছুই বলেন না, অথচ মুসলিম মহিলাদের ঘোমটা বা পর্দার সমালোচনায় তাঁরা পঞ্চমুখ। কারণ এটা না-কি নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের প্রতীক!

মিশরীয় এক বোন আমাকে বলেন, আমি যেন জাপানে ফিরে গিয়েও এ পোশাক ব্যবহার করি। এতে আমি অসম্মতি জানাই। আমার ধারণা ছিল, আমি যদি এ ধরণের পোশাক পরে জাপানের রাস্তায় বের হই তাহ'লে মানুষ আমাকে অভদ্র ও অস্বাভাবিক ভাববে। পোশাকের কারণে তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আমার কোন কথাই তারা শুনবে না। আমার বাইরের বেশ-ভূষা দেখেই তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামের মহান শিক্ষা ও বিধানাবলী জানতে চাইবে না।

আমার মিশরীয় বোনকে আমি এ যুক্তিই দেখিয়েছিলাম। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে আমি আমার নতুন পোশাককে ভালবেসে ফেলি। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, জাপানে গিয়েও আমি এ পোশাকই পরব। এ উদ্দেশ্যে আমি জাপানে ফেরার কয়েকদিন আগে হালকা রঙের ঐ জাতীয় কিছু পোশাক এবং কিছু সাদা খিমার (বড় চাদর জাতীয় ওড়না) তৈরি করলাম। আমার ধারণা ছিল, কালোর চেয়ে এগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সাধারণ জাপানীদের দৃষ্টিতে।

আমার সাদা খিমার বা ওড়নার ব্যাপারে জাপানীদের প্রতিক্রিয়া ছিল আমার ধারণার চেয়ে অনেক ভাল। মূলতঃ আমি কোনরকম প্রত্যাখ্যান বা উপহাসের সম্মুখীন হইনি। মনে হচ্ছিল, জাপানীরা আমার পোশাক দেখে আমি কোন ধর্মাবলম্বী তা না বুঝলেও আমার ধর্মানুরাগ বুঝে নিচ্ছিল। একবার আমি শুনলাম, আমার পিছনে এক মেয়ে তার বান্ধবীকে আস্তে আস্তে বলছে, দেখ একজন বৌদ্ধ ধর্মজাযিকা।

একবার ট্রেনে যেতে আমার পাশে বসলেন এক আধাবয়সী ভদ্রলোক। কেন আমি এরকম অদ্ভুত ফ্যাশানের পোশাক পরেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমি একজন মুসলিম। ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দেহ ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখে। কারণ তাদের অনাবৃত দেহসুষমা ও সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকর্ষিত করে তুলতে পারে। অনেক পুরুষের জন্য এ ধরণের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর। তাই নারীদের উচিৎ নয় দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদেরকে বিরক্ত করা বা সমস্যায় ফেলা।

মনে হ'ল আমার ব্যাখ্যায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত আজকালকার মেয়েদের উত্তেজক ফ্যাশান মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর নামার সময় হয়েছিল। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন এবং বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু জানার। কিন্তু সময়ের অভাবে পারলেন না।

গ্রীষ্মকালের রৌদ্রতপ্ত দিনেও আমি পুরো শরীর ঢাকা লম্বা পোশাক পরে এবং 'খিমার' দিয়ে মাথা ঢেকে বাইরে যেতাম। এতে আমার আব্বা দুঃখ পেতেন। ভাবতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম রৌদ্রের মধ্যে আমার এ পোশাক খুবই উপযোগী। কারণ এতে মাথা, ঘাড় ও গলা সরাসরি রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। উপরন্তু আমার বোনেরা যখন হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করত, তখন ওদের সাদা উরু দেখে আমি অস্বস্তিবোধ করতাম।

Contents

ঈমানের সুধারস

(এক)

বছর কয়েক আগে তাওহীদের ডাকে নওমুসলিমদের কাহিনী লিখতে গিয়ে বেশ কয়েকজন ভিনদেশী নওমুসলিমের সাথে কথা হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। কিন্তু সামনাসামনি এমন কারো সাথে কথা বলার অভিজ্ঞতা হ'ল সম্প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক প্রোগ্রামে যাওয়ার সময় পরিচয় হয়েছিল এক চাইনিজের সাথে। ভেবেছিলাম আমাদের ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র। কিন্তু ২/৩ দিন পর এক রাতে যখন আমরা একসাথে খেতে বসলাম, তখন জানতে পারলাম আসলে তিনি এখানকার ছাত্র নন। ব্যবসার কাজে এসেছেন পাকিস্তানে ক'দিনের জন্য। এক চাইনিজ ছাত্রের গেস্ট হিসাবে আছেন এখানে। বয়স ৩২। অবশ্য কোনভাবেই তা বোঝার উপায় নেই। যে কেউ সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ বালক ভেবে ভুল করবে। আফ্রিকায় তার ব্যবসা আছে। গতমাসে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন ব্যবসার কাজে, এখন পাকিস্তানে এসেছেন এখানকার বাজার দেখতে।

আমাদের এখানে এমনিতে চাইনিজ ছাত্র প্রচুর। কমপক্ষে ছয় শতাধিক হবে। যারা সবাই জন্মগতভাবে মুসলিম। অধিকাংশই এসেছে মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে। সে জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না যে সে 'জন্মগত' মুসলিম' কি-না। কিন্তু এই ভাই সাংহাই প্রদেশের শুনে জিজ্ঞেস করলাম তিনি নওমুসলিম কি-না। জানালেন হ্যাঁ, ২০০৮ সালে মুসলিম হয়েছেন। তারপর একে একে পরিবার ও সমাজ থেকে বাধা পাওয়া, জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন। আফ্রিকা মহাদেশের টগোতে গিয়ে প্রথম মুসলমানদের সংস্পর্শে আসা, তারপর দেশে ফিরে কুরআনের চাইনিজ অনুবাদ পড়তে গিয়ে মুগ্ধ হওয়া, পরিশেষে কুরআনে মানবশিশু জন্মের নিখুঁত বর্ণনা পড়ে বিস্ময়াভূত হওয়া এবং অবশেষে মুসলমান হওয়া। *ফালিল্লাহিল হামদ*। বললেন, মায়ের পেটে শিশুর গঠনপ্রক্রিয়া যে ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়েছে কুরআনে, তা ১৪০০ বছর পূর্বে কোনভাবেই কারো জানার সুযোগ ছিল না। এই একটি আয়াতই আমাকে আর স্থির থাকতে দিল না। আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এটা আল্লাহর বাণী।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে থাকি তার কাহিনী। তার বহুদূরে কোথাও নিবিষ্ট হয়ে থাকা আনমনা দৃষ্টি, চোখের কোণে হঠাৎ জমে ওঠা আনন্দাশ্রুর ঝিলিক, আপন স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার অসীম পরিতৃপ্তিতে ভরা চেহারা বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছিল 'ঈমান' নামক আরাধ্য সেই পরশ পাথরের স্পর্শ কত অমূল্য, কত প্রশান্তিময়।

বিদায়ের সময় হাত ধরে বার বার দো'আ চাইলেন, যেন সবকিছুর বিনিময়ে হ'লেও মহামূল্যবান ঈমানটাকে যেন আমৃত্যু আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন। কারণ তার পিতা-মাতা তার উপর বেজায় অসন্তুষ্ট। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের একটাই কথা, 'তুমি আমাদের সন্তান হয়ে এটা কি করলে! তুমি কি টেরোরিস্ট হবে?! তুমি সুইসাইড বোম্বার হবে?! মিডিয়ার কল্যাণে অধিকাংশ মানুষের মত তার পরিবারও ইসলামকে টেরোরিস্টদের ধর্ম হিসাবে জানে। ফলে এখন তাকে পরিবার এবং নিজ শহর ছেড়ে বাইরে দূরের এক শহরে থাকতে হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে চাইনিজদের বিলাসী বস্তুবাদী জীবনের তুমুল বাদ্য থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ।

পরদিন রাতে ছালাত শেষ করে বের হবার সময় আবার দেখা হোস্টেল চত্বরে। চাইনিজ খাবার খাওয়াবেন। তার আন্তরিকতার কাছে পরাজিত হলাম। এক দোকান থেকে কিনে আনা হ'ল প্যাকেট চাইনিজ খাবার। বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী মাটন কোপ্তা। তারপর রুমে আসার পর খাবারটি গরম পানিতে সিদ্ধ করে প্রস্তুত করা হ'ল। খেতে বসে নির্ধারিত সুন্নাতসমূহের প্রতি তার তীক্ষ্ণ নযর দেখে আবারও চমৎকৃত হই। মনে মনে লজ্জিতও হই। একজন নওমুসলিমের কাছে ঈমানদারিত্বের প্রতিযোগিতায় কি হেরে যাচ্ছি! স্রষ্টার প্রতি নতি স্বীকার যাদের জীবনধারাকে আমূল বদলে দিয়েছে, চক্ষুশীতলকারী সুউচ্চ জীবনবোধে সমৃদ্ধ করেছে, ভোগবাদী দুনিয়ার অপ্রতিহত আকর্ষণকে দু'পায়ে ঠেলে দেবার দুঃসাহস যুগিয়েছে, তাদেরই একজনের সাথে যাপিতের জীবনের এক খণ্ডাংশ বিনিময়, স্মৃতির পাতায় বেশ গাঢ় কালিতেই লেখা হয়ে রইল।

(দুই)

৪ঠা মে ২০১৫ইং। হোস্টেলের বাইরে সবুজ খোলা চত্বরে মাগরিবের ছালাত আদায় করতে গেলাম। আব্দুল কাবীর আফগানীর সুললিত তেলাওয়াত সাধারণত মিস করতে চাই না। ছালাত পর বরাবরের মত তাবলীগ জামা'আতের একজন ঘোষক তাদের বয়ানে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন। সুন্নাত ছালাত পড়ছিলাম। এরই মধ্যে বক্তব্য শুরু হয়ে গেল। ছালাত শেষে উঠতে গিয়েও বসে যেতে বাধ্য হলাম। কারণ বক্তার ইখলাছপূর্ণ বাচনভঙ্গি। একটু পরেই চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম, বক্তা পূর্ব পরিচিত একজন। বিখ্যাত সাবেক পাকিস্তানী ক্রিকেটার সাঈদ আনোয়ার। প্রায় আধা ঘণ্টা বক্তব্য রাখলেন। এত আবেগময়, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য অনেকদিন শুনিনি। সবগুলো কথা অন্তর ছুঁয়ে গেল। ইসলামকে যারা নতুনভাবে চিনেছেন, তারা যে ইসলামের সৌন্দর্য অনেক গভীরভাবে অনুভব করেন, সেটাই যেন প্রকাশ পেল বার বার।

প্রথমেই বললেন, 'আমার বক্তব্য রেকর্ড করার কোন প্রয়োজন নেই। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অফিসের বস যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন কি কেউ তা রেকর্ড করেন? তারপরও সেটা মনে থাকে কেন? কারণ আপনি তা পালন করার জন্য প্রকৃত হক আদায় করে শোনেন। আমি আপনাদের কাছে সেই মনোযোগই কামনা করছি'।

তারপর একজন মুসলমানের উপর দ্বীনের প্রভাব কেমন থাকা উচিৎ, মসজিদের সাথে আমাদের কেমন সম্পর্ক থাকা উচিৎ, সে বিষয়ে অসাধারণ কিছু উদাহরণ পেশ করলেন। একপর্যায়ে আরবদের প্রশংসা করে বললেন, 'আরব ভাইদের মত ছালাতের প্রকৃত হক্ব আদায় করা, খুশূ-খুযূ রক্ষা করে ছালাত আদায় করা আমি আর কোথাও দেখি না। চার ইমামের তিন ইমামই বলেছেন তা'দীলে আরকান তথা ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় না করলে ছালাত আদায় হবে না। কেবল ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে। অথচ মানুষ আজ ইমাম আবু হানীফার এই কথার অনুসরণে ঢপাঢপ ছালাত আদায় করে। আমি বলি, যে ছালাত মাকরূহ হয়, সে ছালাত কী আসলে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়? তাহ'লে কেন আমরা এভাবে পড়ি? রুকু ও সিজদার মধ্যবর্তী দো'আ, দুই সিজদার মধ্যবর্তী দো'আ- এসব তো আমরা ভুলেই গেছি'।

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজকের যুগে একজন ছাত্রের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয় হ'ল, অকারণে রাত্রি জাগরণ। এশার ছালাত পরবর্তী সময়ে যারা অকারণে জেগে থাকে আর দিনমান ঘুমিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে দুনিয়া-আখেরাতের কোন কল্যাণ নেই। তার কর্মকাণ্ডেও কোন বরকত হয় না'।

অতঃপর বরকতের একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বললেন, কুকুর একসাথে অনেক বাচ্চা দেয়, কিন্তু তারপরও এদের বংশবৃদ্ধি সেই মাত্রায় হয় না। কারণ তারা সারা রাত জেগে থাকে আর দিনে ঘুমায়। ফলে তাদের মধ্যে বরকত নেই। আর ছাগল সেই তুলনায় বাচ্চা দেয় কম, কিন্তু এদের উপর বরকত এত বেশী যে সারা দুনিয়ার প্রতিদিন লক্ষ-কোটি ছাগল যবেহ হ'লেও ছাগলের পালের কোন কমতি দেখা যায় না। এটাই হ'ল বরকত।

পরিশেষে সালাম দিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। সম্মিলিত মুনাজাতের ধার ধারলেন না। সংক্ষিপ্ত সময়ে মানুষটার মধ্যে খুলূছিয়াতের যে চর্চা দেখতে পেলাম, তাতে মুগ্ধ হলাম। মনে হ'ল, গতানুগতিক তাবলীগ জামা'আতের মধ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল নিয়ে চরম গাফিলতি দেখা যায়, উনি তেমনটি নন। বক্তব্যের মধ্যে কয়েকবারই বিশুদ্ধ আমল এবং ইত্তিবায়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা জোর দিয়ে বললেন। যাকে একসময় ক্রিকেটার হিসাবে দেখেছিলাম, তাঁকে আজ চোখের সামনে এত হৃদয়গ্রাহীভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেখে মনটা অদ্ভুত ভাললাগায় ভরে গেল। আল্লাহ তাঁকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর কবুল করুন...আমীন।

-লেখক : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ. ইআইইউ, পাকিস্তান।

আলোকপাত

তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন (০১/৪৬) : ব্রেলভী তরীকার উৎপত্তি ও তাদের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?

-মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
মালএশিয়া।

উত্তর : ১৮৮০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বায়বেরেলীতে ব্রেলভী মতবাদের জন্ম হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং ছূফীবাদে বিশ্বাসী আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) এই মতবাদের জনক। ব্রিটিশ আমলে 'আশেকে রাসূল' নামে এই মতবাদটি পরিচিত ছিল। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হ'লেও তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা। যার মধ্যে তিনটি হ'ল প্রধান : (১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে। (২) খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা হুলূল (حلول) ও ইত্তেহাদ (اتحاد) দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল (حلول) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে, নররূপে নারায়ণ। (৩) ইত্তেহাদ বা ওয়াহাদাতুল উজূদ (وَحْدَةُ الْوُجُوْد) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শনকে বুঝায়, যা হুলূল-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া (اَلْفَنَاءُ فِيْ اللهِ)। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সব কিছুই আল্লাহ্র অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয়। নাঊযুবিল্লাহ।

ব্রেলভী তরীকার আক্বীদা ও আমল :

(এক) আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন, কুরআনের ধারক আমাদের সরদার এবং আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লাওহে মাহফূযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন *(খালেছুল ই'তিক্বাদ, পৃঃ ৩৩)*।

(দুই) তাদের মতে, বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টির যাবতীয় কর্ম নিজে উপস্থিত থেকে দেখছেন। তিনি নূরের তৈরী এবং সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দ্রষ্টা)। আহমাদ ইয়ার খান আরো বলেন, তিনি তাঁর অবস্থানস্থল হ'তেই দুনিয়ার সবকিছু দেখেন নিজ হাতের তালু দেখার ন্যায়। তিনি নিকটের ও দূরের সব আওয়ায শুনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী চক্কর দিতে পারেন ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন *(আহমাদ ইয়ার খান, মাওয়াইযু নাঈমিয়াহ, পৃঃ ১৪; জা-আল হাক্ব ১/১৬০ পৃঃ)*।

(তিন) আল্লাহ্র ওলীরা রবের মর্যাদা তুল্য। সুতরাং তাদের থেকেও রহমত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওলীদের কাছেও দো'আ করা যায় *(ব্রেলভী তা'লীমাত, পৃঃ ১৬; জা-আল হাক্ব, পৃঃ ৩৩৫)*।

(চার) তাদের বিশ্বাস মতে, রাসূল (ছাঃ) এমন ক্ষমতার অধিকারী, যার মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়া পরিচালনা করে থাকেন। তাদের একজন বড় নেতা আমজাদ আলী ব্রেলভী বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) হলেন আল্লাহ্র সরাসরি নায়েব (প্রতিনিধি)। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর পরিচালনার অধীন। তিনি যা খুশী করতে পারেন এবং যাকে খুশী দান করতে পারেন। যাকে খুশী নিঃস্বও করতে পারেন। তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মনে করে না, সে সুন্নাত অনুসরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে'। আহমাদ রেযা খান ভক্তির আতিশয্যে লিখেছেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে আল্লাহ বলতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন পার্থক্যও করতে পারছি না' *(হাদায়েকে বখশীশ ২/১০৪)*।

(পাঁচ) তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওলী-আওলিয়ারাও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আহমাদ রেযা খান বলেন, 'হে গাওছ (আব্দুল কাদের জিলানী)! 'কুন' বলার ক্ষমতা লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে, আর আপনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে। আপনার কাছ থেকে যা-ই প্রকাশিত হয়েছে তা-ই দুনিয়া পরিচালনায় আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে আপনিই আসল কারিগর'।

(ছয়) তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ যেহেতু একা, সেহেতু একাই তাঁর পক্ষে পুরো বিশ্বজগৎ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাঁর বিশ্ব পরিচালনার সুবিধার্থে আরশে মু'আল্লায় একটি পার্লামেন্ট কায়েম করেছেন। সেই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪১ জন। আল্লাহ তাদের স্ব স্ব কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে নাজীব ৩১৯ জন, নাক্বীব ৭০ জন, আবদাল ৪০ জন, আওতাদ ৭ জন, কুতুব ৫ জন এবং একজন হলেন গাওছুল আযম, যিনি মক্কায় থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবদাল ৪০ জন। তারা আল্লাহ তা'আলার মধ্যস্থতায় পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ দূরীভূত করে থাকেন। তারা আউলিয়াগণের দ্বারা সৃষ্টজীবের হায়াত, রুযী, বৃক্ষ জন্মানো ও মুছীবত বিদূরণের কার্য সম্পাদন করেন।

(সাত) আহমাদ রেযা খান বলেন, যার কাফনে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু... পূর্ণ কালেমা লেখা হবে, তার কবর যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তার কবরে মুনকার-নাকীর আসবেন না *(ফাতাওয়া রিযবিয়া ৪/১২৭ পৃঃ ব্রেলভী তা'লীমাত, পৃঃ ৪৩)*।

(আট) তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈদ হ'ল, ঈদে মীলাদুন্নবী। এই দিন তারা মহা ধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ভক্তিপূর্ণ গান পরিবেশন করে ও আনন্দ-ফূর্তি করে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনার জন্য এদিন তারা তথাকথিত সীরাত মাহফিল করে থাকে।

প্রশ্ন (০২/৪৭) : পৃথিবীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি কয়টি ও কি কি?

-রাসেল, নাটোর

উত্তর : পৃথিবীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির সংখ্যা মোট ছয়টি। যথা- (১) কওমে নূহ (২) 'আদ (৩) ছামূদ (৪) কওমে লূত (৫) মাদইয়ান ও (৬) কওমে ফেরাউন। উল্লেখ্য, কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে *(তওবা ৯/৭০)*।

প্রশ্ন (০৩/৪৮) : ইসলামী বিধান প্রণয়নে আহলেহাদীছদের অনুসৃত নীতিমালা কী? দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা

উত্তর : শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ইসলামী বিধান প্রণয়নে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের অনুসৃত 'ইস্তিদলালী পদ্ধতি' বা দলীল গ্রহণের নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (১) কোন বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ পেলে তাঁরা তাই গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মুখ ফিরানোকে তাঁরা জায়েয মনে করেন না (২) কোন বিষয়ে কুরআনের কোন নির্দেশ অস্পষ্ট হ'লে সেক্ষেত্রে 'সুন্নাহ' ফায়ছালাকারী হবে। উক্ত হাদীছ সর্বত্র প্রচারিত থাকুক

বা না থাকুকু, তার উপরে ছাহাবীগণ বা ফক্বীহগণ আমল করুন বা না করুন। কোন বিষয়ে 'হাদীছ' পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর 'আছার' কিংবা কোন মুজতাহিদের 'ইজতিহাদ' গ্রহণযোগ্য হবে না (৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরেও কোন বিষয়ে হাদীছ না পাওয়া গেলে আহলেহাদীছগণ ছাহাবী ও তাবেঈগণের যেকোন একটি জামা'আতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোন একটি দল, শহর বা এলাকার অধিবাসীকে নির্দিষ্টভাবে অগ্রগণ্য করেন না (৪) যদি কোন খুলাফায়ে রাশেদীন ও ফক্বীহগণ একমত হন, তবে তাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন (৫) কিন্তু যদি সেখানে মতভেদ থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিদ্বান, পরহেযগার ও স্মৃতিধর তাঁর কথা অথবা তাঁদের মধ্যকার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কথাটি গ্রহণ করেন (৬) যখন কোন বিষয়ে সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়, তখন সেক্ষেত্রে তাঁরা দু'টিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন (৭) কিন্তু যখন সেটিতেও ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ ও ইঙ্গিত সমূহ এবং উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন করেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ের অনুরূপ বিগত কোন অভিন্ন নযীর বা কাছাকাছি দৃষ্টান্ত তালাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রচলিত কোন উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের অনুসরণ করেন না। বরং যে কথাটি তাঁরা উত্তমরূপে বুঝতে পারেন ও যা তাঁদের হৃদয়কে সুশীতল করে, তারই অনুসরণ করেন *(শাহ* অলীউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল *বালিগাহ, ১/১৪৯ পৃঃ; গৃহীত : আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃঃ ২৩)*।

প্রশ্ন (০৪/৪৯) : মুসলিম শাসিত উমাইয়া খেলাফত, আব্বাসীয় খেলাফত, স্পেনীয় উমাইয়া খেলাফত, ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন ও ওছমানীয় খেলাফতের সময়কাল জানতে চাই?

-ইকবাল বিন জিন্নাহ, পাবনা

উত্তর : উমাইয়া খেলাফত : ৪১-১৩২ হিঃ/৬৬১-৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত। মোট ৯০ বছর। রাজধানী দামেস্ক। আব্বাসীয় খেলাফত : ১৩২-৬৫৬ হিঃ/৭৫০-১২৫৮ খৃঃ। মোট ৫০৯ বছর। রাজধানী বাগদাদ। স্পেনীয় উমাইয়া খেলাফত : ৯২-৮৯৭ হিঃ/৭১১-১৪৯২ খৃঃ। মোট ৭৮১ বছর। রাজধানী গ্রানাডা। ভারতের মুসলিম শাসন : ৩৫১-১২৭৩ হিঃ/৯৬২-১৮৫৭ খৃঃ। মোট ৮৯৫ বছর। কেন্দ্রস্থল গযনী (কাবুল) ও দিল্লী। ওছমানীয় খেলাফত : ৭০০-১৩৪২ হিঃ/১৩০০-১৯২৪ খৃঃ। মোট ৬২৪ বছর। রাজধানী ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপল ও তুরস্ক। অতএব পৃথিবী সর্বমোট ২৮৯৯ বছর মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল।

প্রশ্ন (০৫/৫০) : দ্বীন কারা ধ্বংস করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান, নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : যিয়াদ বিন হুদায়ের (রাঃ) বলেন, আমাকে একদিন ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, তুমি কি জানো কোন্ বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি বস্তু : (১) আলেমের পদস্খলন (২) আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন *(দারেমী হা/২১৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৬৯)*। খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكُ+ وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا؟ 'দ্বীনকে ধ্বংস করে মাত্র তিনজন : অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টমতি আলেমরা ও ছূফী পীর-মাশায়েখরা।

প্রথমোক্ত লোকদের সামনে ইসলামী শরী'আত ও রাজনীতি সাংঘর্ষিক হ'লে তারা রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেয় ও শরী'আতকে দূরে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তাদের রায়-ক্বিয়াস ও যুক্তির সঙ্গে শরী'আত সাংঘর্ষিক হ'লে নিজেদের রায়কে অগ্রাধিকার দেয় এবং হারামকে হালাল করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা কথিত কাশ্ফ ও রুচির বিরোধী হ'লে শরী'আতের প্রকাশ্য হুকুম ত্যাগ করে ও কাশ্ফকে অগ্রাধিকার দেয় *(শরহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়া, পৃঃ ২০৪; জিহাদ ও ক্বিতাল, পৃঃ ৮৫)*।

প্রশ্ন (০৬/৫১) : ইসলামী আন্দোলন না বলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বলার পিছনে যুক্তি কী?

-আলতাফ হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শী'আ, সুন্নী, শিরকী, বিদ'আতী সহ সকল মত ও পথের মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের নামে যে কোন দলে শরীক হ'তে পারেন। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা। যেখানে শিরক ও বিদ'আত বর্জিত প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলমানই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনে মানব রচিত মতবাদের অনুসারী রায়পন্থী কোন মুসলমানের অংশগ্রহণের অবকাশ নেই। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আহলেহাদীছ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছেই পাওয়া সম্ভব, অন্য কোথাও নয়। তাই আহলেহাদীছ আন্দোলনকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন বলে আমরা বিশ্বাস করি *(আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃঃ ৫২)*।

প্রশ্ন (০৭/৫২) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একজন প্রাথমিক সদস্য সৃষ্টির ধারাবাহিকতা তথা পদ্ধতিসমূহ জানতে চাই

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন, কুড়িগ্রাম

উত্তর : বন্ধু টার্গেট করে প্রথম সাক্ষাতেই আন্দোলনের দাওয়াত দেয়া চলবে না। বরং স্বাভাবিক যোগাযোগের মাধ্যমে গভীর আন্তরিকতা গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা মুতাবেক দু'তিনবার এমনিতে যাতায়াত করে বন্ধুর প্রকৃতি, পরিবার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচিত হ'তে হবে এবং বন্ধুর সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে গাঢ় আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে হবে। এতে কৃতকার্য হ'লে সময় পরিবেশ ও মেযাজ বুঝে বন্ধুকে প্রথম মানব সৃষ্টির রহস্য ও তাওহীদের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। মানব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর পদাংক অনুসরণের গুরুত্ব এবং আখেরাতের যাবতীয় কর্মের জওয়াবদিহিতে সম্পর্কে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। অতঃপর নির্দিষ্ট একটি তরীকা বা মাযহাবের তাক্বলীদের ফলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে শরী'আত অনুসরণে যে বাঁধার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে খুব ধৈর্যের সঙ্গে বুঝাতে হবে। আলোচনায় যেন সর্বদা হাসিমুখ বজায় থাকে এবং কোনক্রমেই যাতে বন্ধুর মনে বিরক্তির সৃষ্টি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে। পরক্ষণে তাকে জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে হবে। এতে কৃতকার্য হ'লে অবশেষে 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে এজন বন্ধুর মাঝে গঠনতন্ত্রের ৭ নং ধারার ১ নং উপ-ধারায় বর্ণিত নিম্নোক্ত সকল শর্ত পরিলক্ষিত হ'লে তখনই তাকে প্রাথমিক সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

গঠনতন্ত্রের ৭ নং ধারার ১ নং উপ-ধারায় বর্ণিত শর্তসমূহ : অনধিক ৩২ বছরের যে সকল তরুণ, যুবক ও ছাত্র (ক) নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত 'সিলেবাস' অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) 'প্রাথমিক সদস্য' ফরম পূরণ করেন এবং সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

প্রশ্ন (০৮/৫৩) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শাখা গঠনের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চাই।

জাহিদুল ইসলাম, লালমনিরহাট

উত্তর : কোন গ্রাম, মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রাবাসে কমপক্ষে তিনজন 'প্রাথমিক সদস্য' থাকলে এলাকার অনুমোদন সাপেক্ষে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে। সদস্য সংখ্যা বেশী থাকলে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক নিয়ে মোট ৯ (নয়) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'শাখা কর্মপরিষদ' গঠন করতে হবে। যেলা না থাকলে উক্ত শাখা কেন্দ্র কর্তৃক সরাসরি অনুমোদিত হবে। অতঃপর শাখার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে শাখার কার্যালয় স্থাপিত হবে।

প্রশ্ন (০৯/৫৪) : রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের মাঝে কথোপকোথনের ঘটনা বিস্তারিত জানাবেন।

-আব্দুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান ইবনু হরব তাকে বলেছেন, রাজা হিরাক্লিয়াস একদা তাঁর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। তিনি তখন ব্যবসা উপলক্ষ্যে কুরাইশদের কাফেলায় সিরিয়ায় ছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সে সময় আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সাথী সহ হিরাক্লিয়াসের নিকট আসলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে- তোমাদের মাঝে বংশের দিক হতে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন, তাকে আমার অতি নিকটে আন এবং তার সাথীদেরকেও তার পেছনে বসিয়ে দাও।

অতঃপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের বলে দাও, আমি এর নিকট সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব, যদি সে আমার নিকট মিথ্যা বলে তখন সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাকে মিথ্যুক বলবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার যদি এ লজ্জা না থাকত যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে তবে আসি অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

অতঃপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন, বংশমর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে সে কিরূপ? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এর পূর্বে আর কখনো কি কেউ এরূপ কথা বলেছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান শ্রেণীর লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে না-কি দুর্বল লোকেরা? আমি বললাম, দুর্বল লোকেরা। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? আমি বললাম, তারা বেড়েই চলেছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে ঢুকে কি কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাঁর দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি কি সন্ধি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা তার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এ কথাটি ব্যতীত নিজের পক্ষ হতে আর কোন কথা যোগ করার সুযোগ আমি পাইনি। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের পরিণাম তোমাদের কি হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কূপের বালতির ন্যায়। কখনো তাঁর পক্ষে যায় আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে। তিনি বললেন, তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর অংশীদার সাব্যস্ত করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলে তা ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের ছালাত আদায়ের, সত্য বলার, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার এবং আরবীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দেন।

অতঃপর তিনি দোভাষীকে বললেন, তুমি তাকে বল, আমি তোমার নিকট তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তুমি তার জবাবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এ কথা তোমাদের ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কি-না? তুমি বলেছ, না। তাই আমি বলছি, পূর্বে যদি কেউ এরূপ বলত তবে আমি অবশ্যই বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বসূরির কথারই অনুসরণ করেছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি-না? তুমি তার জবাবে বলেছ, না। তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এর পূর্বে কখনো তোমরা তাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ কি-না? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তাকে অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বস্তবেও এই শ্রেণীর লোকেরাই হন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করে কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, না। ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সঙ্গে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কি-না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, তারা সন্ধি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর অংশীদার স্থাপন না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন ছালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও সচ্চরিত্র থাকবে। (হে আবু সুফিয়ান!) তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এই দু'পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য হতে হবেন এ কথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর নিকটে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট সহ্য করে নিতাম। আর আমি যদি তাঁর নিকট থাকতাম তবে অব্যশই তাঁর দু'খানা পা ধৌত করে দিতাম। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সেই পত্রখানি আনার নির্দেশ দিলেন, যা তিনি দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ)-কে দিয়ে বছরার শাসকের মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল :

'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'। আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে।

'হে আহলে কিতাব! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই যেন তার শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করে আল্লাহকে ত্যাগ করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*।

আবু সুফিয়ান বলেন, হিরাক্লিয়াস যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা চরমে পৌঁছল এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হল। আমাদেরকে বের করে দিলে আমি আমার সাথীদের বললাম, আবু কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু আসফার (রোম)-এর বাদশাও তাকে ভয় পাচ্ছে! তখন থেকে আমি মনে রাখতাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব দান করলেন *(বুখারী হা/৭)*।

প্রশ্ন (১০/৫৫) : 'আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন মানুষ ভাল হয়ে যাবে। নেতাগণ ও ফকীহগণ' হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহীম, সাতক্ষীরা

উত্তর : হাদীছটি জাল ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬)*।

প্রশ্ন (১১/৫৬) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রথম দফা কর্মসূচী 'তাবলীগ' বা প্রচারের করণীয় কি বিস্তারিত জানতে চাই

আসাদুযযমান, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : প্রথম দফা কর্মসূচী 'তাবলীগ' বা প্রচারের ক্ষেত্রে করণীয় নিম্নরূপ : (ক) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতি স্থাপন (খ) প্রতিদিন বাদ এ'শা মহল্লার মসজিদে ব্যাখ্যাসহ কুরআন ও হাদীছ শুনানো (গ) তাবলীগী সফরে বের হওয়া (ঘ) তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা (ঙ) সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম (চ) বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রচার কার্যক্রম (ছ) সামষ্ঠিক পাঠ, চা-চক্র ইত্যাদি (জ) পোস্টারিং, বুকলেট, পরিচিতি ও সাময়িকী বিতরণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১২/৫৭) : ওআইসি (OIC) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?

- শফিকুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : The Organization of Islamic Cooperation (OIC). এর পূর্বের নাম ছিল Organization of the Islamic Conference. এটি জাতিসংঘের পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা। যা চার মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। এটি মুসলিম বিশ্বের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম। এটি বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসার এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য জোরালো ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধানের আলোকে, যা ছিল জেরুযালেমের আল-আক্বছা মসজিদে অপরাধমূলক অগ্নিসংযোগ। ফলে এটি মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৩৮৬ হিরজীর ১২ই রজব অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এটি এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৪০ বছরে এর সদস্য রাষ্ট্র ২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ পৌঁছেছে। সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত করা হয় এবং ইসরাঈলের সাথে ক্যাম্প ডেবিড চুক্তি সম্পাদনের দরুন ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মিশরের সদস্যপদও স্থগিত থাকে। এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে : (১) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা (২) বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা (৩) পারস্পরিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহায়তা করা এবং (৪) প্যালেস্টাইনি জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার পুনরুদ্ধার করা। (৫) জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রের সারকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শমূলক সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করা (৬) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সহনশীলতা, সংযমশীলতা, আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও বাণিজ্য সহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন। বিশেষ করে শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষায় জোর প্রচেষ্টা চালানো এবং মুসলিম পারিবারিক মূল্যবোধকে সন্নিবেশিত করা।

প্রশ্ন (১৩/৫৮) : 'বায়তুল্লাহ শরীফ' কবে কে এবং কেন চার মুছাল্লা চালু করেছিলেন এবং কে তা উৎখাত করেছিলেন দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-হাবীবুর রহমান, মালদ্বীপ।

উত্তর : বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করেন। এইভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। অতঃপর ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সব মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের নিয়ম অনুযায়ী একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৯)*।

প্রশ্ন : (১৪/৫৯) : নাজী ফেরকার বৈশিষ্ট কয়টি কি কি বিস্তারিত জানতে চাই।

-সুহায়ল আহমাদ, খুলনা

উত্তর : নাজী ফের্কার বৈশিষ্ট মূলতঃ ৭টি। যাথ : (১) তাঁরা সংস্কারক হবেন (২) আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না (৩) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করেন। (৪) তাঁরা জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হন না। (৫) তাঁরা কুফর ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে কটোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন। (৬) তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন। (৭) তাঁরা সর্বাবস্থায় সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করে থাকেন এবং কখনোই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। কেউ তাদেরকে ছেড়ে গেলে সে অবস্থায় তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন ও তাঁর গায়েবী মদদ কামনা করেন (ফিরক্বা নাজিয়াহ, পৃঃ ২৫-৩৪)।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় সংবাদ

২৫তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫ সম্পন্ন

রাজশাহী ২৬ ও ২৭ শে মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী **২৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা** রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ। ১ম দিন বিকাল সাড়ে ৪টায় তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫-এর সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং স্বাগত ভাষণ দেন তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব থেকে প্রদত্ত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস (রাজশাহী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), 'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা দুর্রুল হুদা (মোহনপুর, রাজশাহী), হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (সাতক্ষীরা)।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর : দরসে কুরআন আমীরে জামা'আত (দারুলহাদীছ জামে মসজিদ) এবং প্যাণ্ডেলে মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (মারকাযের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) ও দরসে হাদীছ, (প্যাণ্ডেলে) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। বক্তব্য রাখেন (প্যাণ্ডেলে) অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী), অধ্যাপক আকবার হোসাইন (যশোর), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা)।

জুম'আর খুৎবা : মুহতারাম আমীরে জামা'আত (প্যাণ্ডেলে) এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (দারুলহাদীছ জামে মসজিদে)।

২য় দিন বাদ আছর থেকে : অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (গোদাগাড়ী, রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ইমামুদ্দীন বিন আব্দুর বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) ও অন্যান্য বক্তাগণ।

দেশের চলমান অবরোধ ও হরতালের সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও মুছল্লীদের ব্যাপক উপস্থিতি তাবলীগী ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বাইরের যেলাগুলি থেকে সর্বমোট ১০৮টি রিজার্ভ বাস, ট্রেনের রিজার্ভ বগি ও ১২টি মাইক্রোবাস ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় সব যেলা থেকেই ট্রেন, বাস, মাইক্রো, ভটভটি, মটর সাইকেল, সাইকেল, ইজিবাইক ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন যোগে হাযার হাযার মুছল্লী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব ও সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও মীযানুর রহমান। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুস সালাম (যশোর), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

যুবসমাবেশ

রাজশাহী ২৭ শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় ইজতেমার ২য় দিন প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে পৃথক প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি তার ভাষণে বলেন, জাহেলিয়াতে ভরা সমাজকে পরিবর্তনের জন্য চাই তাওহীদের আলোই আলোকিত দৃঢ়কল্প একদল যুবক। যারা ইমারতের অধীনে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, ইমারতের প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত ইসলামী সংগঠন কায়েম হয় না। আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মী ও কাউন্সিল সদস্যগণ উক্ত অঙ্গীকারে আবদ্ধ। আমরা দো'আ করি তারা যেন আমৃত্যু উক্ত অঙ্গীকারের উপরে দৃঢ় থাকনে।

সমাবেশ 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম বলেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী রেখে গিয়েছিলেন। যারা তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করেছিলেন। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকেও তাঁদের মত রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, একই যেলার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ুন কবীর ও বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বিগত বছরের ন্যায় এবারও গত ২৭ শে মার্চ সকাল ১০ ঘটিকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

Contents

এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত 'সমাজ বিপ্লবের ধারা', 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' এবং ফিরক্বা নাজিয়াহ'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজনকে সনদসহ নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজয়ীদের নাম নিম্নে প্রদান করা হ'ল : প্রথম-আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া, ৭০০০/-)। দ্বিতীয় : শামীম আহমাদ (জয়পুরহাট, ৫০০০/-)। তৃতীয় : শাহীন রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৩০০০/-)। এছাড়াও ৭ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে মোট ২০০০/- করে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল।

দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ ও ৮ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ৭ মে বৃহস্পতিবার বাদ ফজর হ'তে ৮ মে শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী **'যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫'** গ্রুপ 'খ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

শহর পৌর কমিউনিটি সেন্টার, মেহেরপুর ২৩ মে শনিবার : অদ্য বেলা ২-টা থেকে ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর শহর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মেহেরপুর সদর উপযেলা কর্তৃক আয়োজিত এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শহর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সদর উপযেলার সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

পাঁচদোনা, নরসিংদী ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমিনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছাত্তার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক শরীফুদ্দীন ভুইয়াঁ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহফূযুল ইসলাম।

দারুলহাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জ ২২ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে দশটায় দারুলহাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার।

কাঞ্চন বাজার, নারায়ণগঞ্জ ২২ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারুন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

করিবপুর, সাভার, ঢাকা ২৯ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচরুখী দারুলহাদীছ মাদরাসার সাবেক ভাইচ প্রিন্সিপ্যাল শামসুল আলম লাহোরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীর।

কুলুনিয়া পূর্বপাড়া, পাবনা ৪ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কুলুনিয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে যেলার মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন।

কান্দাইল মধ্যপাড়া, নরসিংদী ৬ জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর কান্দাইল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কান্দাইল এলাকা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাঁচরুখী দারুলহাদীছ মাদরাসার মুদীর মুহাম্মাদ মাসউদুল আলম উমরী। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারাণ সম্পাদক মাওলানা দেলওয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শরীফুদ্দীন ভুঁইয়া, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুযযামান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল কাইয়ূম, দফতর সম্পাদক আলহাজ্জ বাদল মিয়া, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছাত্তার, সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসাইন, পাঁচদোনা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হেমায়াতুদ্দীন প্রমুখ।

Contents

যেলা সংবাদ : বগুড়া

বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১লা মে, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শাজাহানপুর উপযেলাধীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' শাজাহানপুর উপযেলা কর্তৃক এক কাউন্সিল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ রামাযান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নওশাদ পারভেজ। উক্ত অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর শাজাহানপুর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রুবেল। পরিশেষে মাওলানা শহীদুল্লাহ ফয়েজীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম রুবেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট শাজাহানপুর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যেলা : গাইবান্ধা পশ্চিম

মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা, ২৪ এপ্রিল গাইবান্ধা : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'যুবসংঘ'-এর মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক রুহুল আমীন।

জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৯ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ এশা জান্নাতপুর এলাকায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত থেকে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক জহুরুল হক্ব ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন।

সৈয়দপুর, রাধাকান্তপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা ২ মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর রাধাকান্তপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সহ-সভাপতি হাফেয ওবাইদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝুনাতলা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আল-আমীন, 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সোবহান ও বিন ইয়ামিন।

যেলা : রংপুর

যেলা কার্যালয়, রংপুর ২৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে 'যুবসংঘ'-এর রংপুর যেলা কর্তৃক আয়োজিত যেলা অফিসে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আদনান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে ২০ জন কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সোনামণি

সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে বেলা ১-টা পর্যন্ত 'সোনামণি' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত ৩য় বার্ষিক **'সোনামনি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর সাবেক পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান ও যেলা 'সোনামণি'-এর উপদেষ্টা এবং 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী মণ্ডলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক মুহাম্মাদ মুনীর, সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন, রজনীগন্ধা শাখার পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, হাসনাহেনা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, রজনীগন্ধা শাখার সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ বিন এরশাদ, হাসনাহেনা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। এবার সোনামণি সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা **'সোনামণি যেলা স্মরণিকা'** প্রকাশ করে, যা উক্ত যেলার 'সোনামণি' সংগঠনের দিশারীর ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া উক্ত সম্মেলনের দু'মাস আগে ৫০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখান তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের নামের তালিকা নিম্নরূপ : প্রথম-মারযিয়া বিনতে রেযাউল করীম, দ্বিতীয়-তানযীলা বিনতে টিক্কা কাযী ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে সুমী বিনতে বেলাল কাযী। এছাড়াও দুইজনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিতি ও সভাপতি মহোদয়। উক্ত সম্মেলন বড়কুড়ার মৃত হারিছ প্রামাণিকের বাড়ীর উন্মুক্ত স্থানে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায এলাকার হাসনাহেনা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

বছরব্যাপী সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

জয়পুরহাট : অদ্য ০৬ মার্চ, শুক্রবার কমরগ্রাম আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদে বাদ জুম'আ যেলা 'সোনামণি'-এর উদ্যোগে বছরব্যাপী এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সোনামণিদের মাঝে ইসলামী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী ও সাধারণ জ্ঞান, আক্বীদা, ছালাত শিক্ষা, উপস্থিত বক্তব্য, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, জাগরণী, ছবি অংকনসহ ১২ মাসে বারটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরই অংশ হিসাবে ফেব্রুয়ারী মাসেও (০৬ মার্চ) আক্বীদা বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মুহাম্মদ মুনায়েম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপভোগ ও পুরস্কার বিতরণ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, সহ-সভাপতি উলফত মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মুযাম্মেল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালামসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর যেলা দায়িত্বশীলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মুহাম্মাদ ফায়ছাল হোসেন (৮ম শ্রেণী), ২য়- মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম দীপু (৮ম শ্রেণী), ৩য়- মুহাম্মাদ এহসান ইলাহী যহীর (৬ষ্ঠ শ্রেণী)। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক মাসে এক একটি বিষয়ের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কার বিতরণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

Contents

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ১০ আগস্টের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৭ (১) :

১. শয়তানের শয়তানী কর্মকাণ্ডের ফলাফল কী?
২. শায়খ বিন বায (রহঃ) কত বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান?
৩. আহলে কিতাব কারা?
৪. একটি শরীরের স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন কোন্টি?
৫. অভিবাসী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?
৬. ২০১৪ সালে আরাফার খুৎবার খত্বীবের নাম কী?
৭. বিশ্বের অন্যতম অভিবাসী পুনর্বাসনকারী দেশ কোন্টি?
৮. কত সালের আদমশুমারীতে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের বাদ দেয়?
৯. মালয়েশিয়ায় কতটি গণকবর ও বন্দিশিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে?
১০. বাংলা সনের 'লিপিয়ার ইয়ার' কোন্টি?
১১ কার আমল থেকে 'পহেলা বৈশাখ' উদযাপন শুরু হয়?
১২. ২০১৪ সালের আরাফার দিন কী বার ছিল?
১৩. 'তায়সীরুছ ছালাত' গ্রন্থের লেখকের নাম কী?
১৪. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কত সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন?
১৫. কত সালে এবং কার মাধ্যমে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. ১৮৩৫ সালে ২. ২০০০-এর অধিক ৩. পরিবার ৪. 'অদ, সু'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসর ৫. নিজের আমল অন্যকে বলে আত্ম-আশ্চর্যবোধ মনে করা ৬. শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ আলে শায়েখ ৭. ওয়াছিল বিন আত্বা ৮. না ৯. ১৫৮১ ১০. ১৯২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ১১. মত প্রকাশের মাধ্যম ১২. শুক্রবার ১৩. ৭টি ১৪. ২টি; ইখলাছ ও প্রশংসার মহব্বত ১৫. সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪

কুইজ ১/৭ (২) :

১. 'যমযম পানি' কী?
২. যমযম আনুমানিক কত বছর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে?
৩. 'যমযম কূপ'-কে কী বলা হয়?
৪. 'যমযম কূপ' কোন্ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?
৫. 'যমযম কূপ'-এর উৎপত্তি কিভাবে হয়?
৬. 'যমযম' শব্দের অর্থ কী?
৭. 'যমযম পানি'-এর বৈশিষ্ট্য কী?
৮. কূপটির গভীরতা কতটুকু?
৯. 'যমযম কূপ' থেকে লোহিত সাগরের দূরত্ব কত কিলোমিটার?
১০. কা'বাগৃহ থেকে কোন্ দিকে কত দূরত্বে উক্ত কূপ অবস্থিত?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. ১০০০ বছর ২. ৯৫০ বছর ৩. ৬টি ৪. নূহকে ৫. তিনজন ৬. সাম ৭. ইয়াফেছ ৮. ১জন; মুহাম্মাদ (ছাঃ) ৯. ইরাকের মুছেল ১০. ২৮টি সূরা; ৮১টি আয়াত ১১. বনু কালবের ১২. মুর্তিপূজা ১৩. পাঁচটি ১৪. ৩ পুরুষ ১৫. তান্নুর।

বর্ণের খেলা ৩/৮ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে শ্রেষ্ঠ ধর্মের নাম জানা যাবে।

১.........................
২.........................
৩.........................
৪.........................

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : ১.মাসোয়ারা ২.নাজেহাল ৩.তকসীম ৪.মণিদীপ।

➢ **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : সোনামণি**

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৭:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :

(ক) ২৫-৭+২৩-১২=৮
(খ) ১৫+১-১৪+৫=৭
(গ) ৮÷২+১২÷২=৬

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*